সোহরাবদের জমিতে ট্রাক্টর দিয়ে ধানচাষের কাজ হচ্ছে। বেশ কিছু বছর আগেও ওই ক্ষেতে হাল-বলদ দিয়েই চাষ হতো।

সোহরাবের বাবা বললেন— ট্রাক্টর দিয়ে চাষ করলে অল্প সময়ে অনেক বেশি জমি চাষ করা যায়। আর খাটনিও কম হয়।

পরদিন স্কুলে গিয়ে সোহরাব জিজ্ঞেস করল— চাষের কাজে এসবের ব্যবহার শুরু হলো কবে?

অনুপ বলল— মামার মুখে শুনেছি, মামাদের ওখানে পাহাড়ে কিছু মানুষ প্রথমে জঙ্গল পোড়ায়। তারপরে ওই জমিতে কোদাল, নিড়ানি দিয়ে চাষবাস করে। আজও সেখানে হাল বা বলদের ব্যবহার শুরু হয়নি।

দিদি বললেন— মানুষের চাষ করতে শেখার একদম প্রথম দিকের আবিষ্কার এটা।

রোকেয়া জিজ্ঞেস করল— মানুষ কবে চাষ করতে শিখেছিল দিদি?

— ঠিক সময় জানা যায়নি। তবে মনে করা হয় আজ থেকে প্রায় নয়-দশ হাজার বছর আগে। তখন মানুষেরা ছোটো ছোটো দলে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়াত খাদ্যের জন্য। খাদ্যের অভাব হলেই মানুষ অন্য জায়গায় চলে যেত। সেসময় মানুষ হয়তো লক্ষ করেছিল পশুপাখির ফল খাবার সময় বা তাদের মলত্যাগের সময় বীজ মাটিতে পড়ে। কিছুদিন পর ওই বীজ থেকে গাছের চারা বেরোচ্ছে। এভাবেই হয়তো সেসময়ের মানুষ বীজ মাটিতে ফেলে চাষের কাজ শিখেছিল।

— চাষের কাজে এরপর তো অনেক পরিবর্তন এসেছে।

— প্রথম দিকের মানুষ মাটিতে বীজ ফেলে ফসল পেলেও তার পরিমাণ ছিল কম। আস্তে আস্তে মানুষ ফলন বাড়ানোর জন্য চাষের নানা ধাপ আবিষ্কার করল।

— ধাপগুলি কী কী?

— চাষ শুরু হয় জমি তৈরি দিয়ে। নিড়ানি বা কোদাল দিয়ে জমি কোপানো হয়। জমিতে তারপর শুরু হয় লাঙল দেওয়া। একাজে প্রথমে বলদকে ব্যবহার করলেও পরে কোথাও কোথাও ঘোড়ার ব্যবহার শুরু হলো।

— মাটি তৈরির পর তো বীজ ফেলা হয় মাটিতে।

— বীজ ফেলার আগে জমির আগাছা পরিষ্কার করতে হয়। আর বীজগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে মাটিতে জল থাকা দরকার।

— এবছর বৃষ্টি ভালো না হওয়ায় অনেক চাষের জমি শুকিয়ে গেছে। বীজ থেকে চারাগাছ হয়নি।

— সেসময়ের মানুষেরও হয়তো একই রকম অভিজ্ঞতা হয়েছিল। এ সমস্যা সমাধান করার জন্য মানুষ আবিষ্কার করেছিল জলসেচ ব্যবস্থা। নদীর জল সারা বছর ধরে রাখা হতো। ওই জলকে চাষের কাজে ব্যবহার করা হতো। আমাদের দেশের চাষিরা বিভিন্ন নদীর জলকে একইভাবে সেচের কাজে লাগাত। এমন কি কুয়ো, নালা থেকে জল তোলার যন্ত্রও ব্যবহার করা হতো।

— জল পেলে গাছ খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে।

দিদিমণি বললেন — গাছের বাড়ার জন্য জল কম বা বেশি হলে কিন্তু বিপদ। আবার শুধু জল হলেই গাছের চলে না। মাটিও ভালো থাকা দরকার।

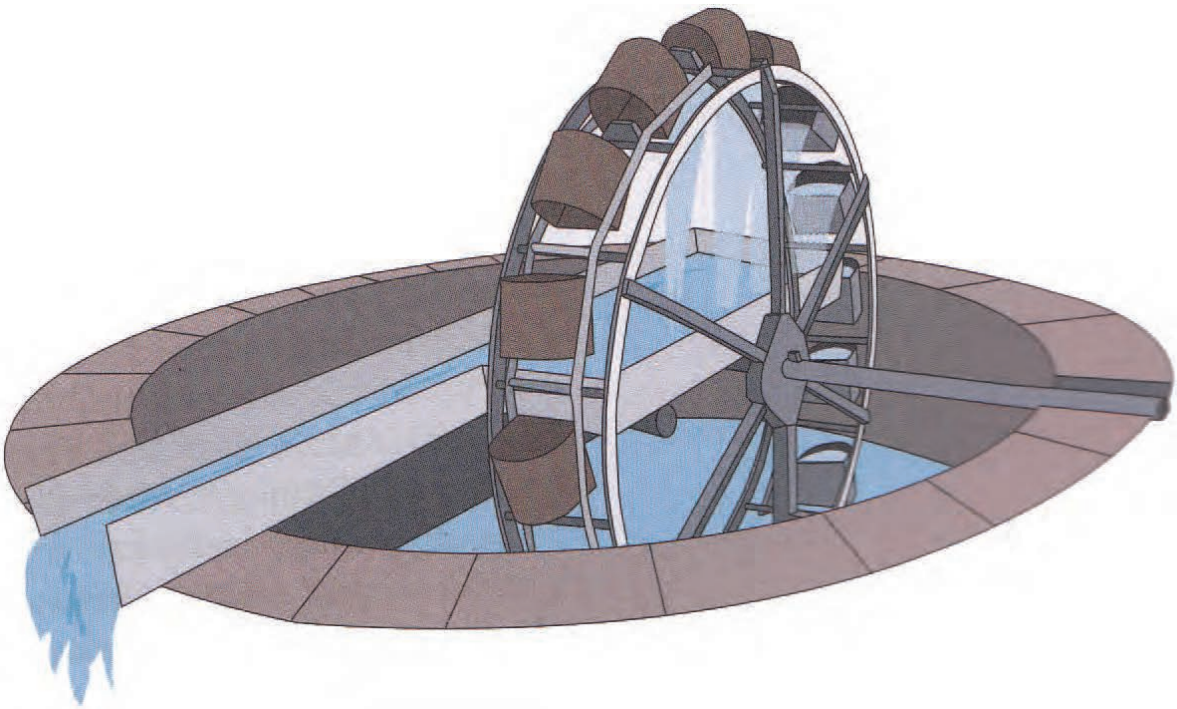

— এজন্যই কি সব মাটিতে চাষ হয় না?

দিদিমণি বললেন — একথা ভাবতে ভাবতেই মানুষ একদিন জমিতে সার ব্যবহার করেছিল। পালিত পশুর মল চাষের জমিতে পড়ে থাকলে চাষ ভালো হতো। কিন্তু চাষের জমির পরিমাণ যখন বাড়ল তখন এত অল্প সারে আর চাষ ভালো হতো না।

বড়োদের/শিক্ষক শিক্ষিকাদের সঙ্গে আলোচনা করে নীচে লেখো :

চাষের ধাপ	কেন করা হয়

অনুপ জিজ্ঞেস করল— তখন কী কী ফসলের চাষ হতো দিদি?

— প্রথমে শুরু হয়েছিল গম, বার্লি আর যবের চাষ। তারপর একে একে মানুষ শিখল ধান, জোয়ার-বাজরা, সোয়াবিন, আলু, স্কোয়াশ, তামাকের চাষ। তবে সব শস্যের চাষ যে একই সময় বা একই জায়গায় শুরু হয়েছিল তা কিন্তু নয়। কোনোটা আজকের আফ্রিকায় তো অন্যগুলো আমেরিকা বা এশিয়ার বিভিন্ন দেশে।

তোমাদের অঞ্চলে যে যে শস্যের, সবজির বা ফলের চাষ হয় তার একটা তালিকা তৈরি করো।

শস্য	সবজি	ফল

তোমার এলাকায় এখন বা বহু বছর ধরে মানুষ জীবিকার প্রয়োজনে চাষের কাজ করছেন। তোমার এলাকার প্রবীণ ব্যক্তি বা দিদিমণির সঙ্গে আলোচনা করে লিখে ফেলো।

চাষের জমি কী করে তৈরি করা হয়	চাষের কাজে কী কী জিনিস ব্যবহার হয়	বহু বছর ধরে কী কী শস্যের চাষ হয়

— চাষের জমিতে যখন ফসল ফলে তখন আমাদের বাবা-কাকার খুব চিন্তা হয়। কোনোবার ধানগাছে পোকা তো কোনোবার ট্যাঁড়শগাছে পোকা লাগে। ওইসব ফসল জমিতেই নষ্ট হয়ে যায়।

— শুধু ধান বা ট্যাঁড়শ নয়, যেকোনো চাষেই পোকা একটা সমস্যা। পোকা মারার জন্য মানুষ নানা বিষ ব্যবহার করতে শুরু করল। প্রথম দিকে শুকনো গোবর পোড়া ছাই বা নিম জাতীয় গাছের পাতার রস ব্যবহার করত। তারপর এল পোকামারার রাসায়নিক বিষ। এতে চাষের ফলন বাড়লেও মাটি কিন্তু নষ্ট হতে লাগল।

— ফসল পাকার পর সেসময়কার মানুষ কী করত?

— কিছু ফসল নিজের ব্যবহারের জন্য গোলায় জমিয়ে রাখত। আর না রাখতে পারলে জমিতেই পড়ে নষ্ট হতো। অনেক ফসল নানা পোকামাকড় ও প্রাণীতে খেয়ে নিত। কিছু ফসল বাজারে বিক্রি করত।

আলোচনা করে লেখো:

চাষের কাজে ব্যবহৃত হাতিয়ার বা যন্ত্রপাতির নাম	কোন কাজে প্রয়োজন হয়
১। নিড়ানি ২। কোদাল ৩। লাঙল ৪। কাস্তে ৫। ট্রাক্টর	

চাষের কাজে লাগে এমন তিনটি জিনিসের ছবি আঁকো:

মানুষ কীভাবে পশুকে পোষ মানাল

তালিকা পূরণ করার পর সরোজ দিদিমণিকে জিজ্ঞাসা করল— চাষের কাজে তো সেসময়ের মানুষ নানা ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা শিখেছিল। কিন্তু চাষের কাজে কোন কোন পশু ব্যবহার করা হতো?

দিদিমণি ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন সময়ে পোষ মানানো জীবজন্তুর নামের তালিকা দিয়ে বললেন — এর কোন কোন প্রাণীকে মানুষ চাষের কাজে বা অন্য প্রয়োজনে ব্যবহার করে?

আলোচনা করে লেখো।

বিভিন্ন জীবজন্তুর নাম	চাষের কাজে ব্যবহার করা হয়/হয় না	অন্য কোন কোন প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়
১. গোরু/বলদ		
২. মুরগি		
৩. কুকুর		

বিভিন্ন জীবজন্তুর নাম	চাষের কাজে ব্যবহার করা হয়/হয় না	অন্য কোন কোন প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়
৪. ভেড়া		
৫. মহিষ		
৬. ঘোড়া		
৭. ছাগল		
৮. হাঁস		
৯. উট		
১০. শুয়োর		

সোহরাব জিজ্ঞেস করল— কীভাবে মানুষ এত ধরনের পশুকে পোষ মানাতে পেরেছিল?

দিদিমণি বললেন— মানুষ তখন সব পশুকেই কিন্তু পোষ মানাতে পারেনি। মানুষ বাঘের মতো হিংস্র জন্তুদের শিকার করত। কিন্তু পোষ মানাতে পারেনি। আবার গোরু, উটকে মানুষ পোষ মানিয়েছিল। মানুষ বাঘকে পোষ মানাতে পারল না, অথচ গোরুকে পোষ মানাতে পারল কেন?

অমল বলল— বাঘ তো হিংস্র, আর গোরু তো খুব শান্ত স্বভাবের।

দিদিমণি বললেন— ঠিক ধরেছ। এছাড়াও মানুষ এমন পশুকেই পোষ মানানোর চেষ্টা করেছিল যারা খুব তাড়াতাড়ি বড়ো হয়। হাতি বড়ো হতে অনেক সময় নেয়। তুলনায় গোরু অনেক কম সময়ে বাড়ে।

অনুপ জিজ্ঞেস করল— বাঘ শুধু মাংস খায়। আবার গোরু নানা ধরনের খাবার খায়। এটাও কী একটা কারণ দিদি?

দিদিমণি বললেন— ঠিক তাই। মাংসাশী প্রাণীদের খাদ্য তৃণভোজী প্রাণীরা। অথচ গোরুরা ঘাসের পাতা, ধানগাছের কাণ্ড, ভুট্টার বীজ খায়। আবার সরষে খোলও খায়। এগুলো সারা বছর ধরে পাওয়া যায়। এছাড়াও এমন কিছু প্রাণী আছে, যারা সহজেই ভয় পেয়ে যায়, বা তাড়াতাড়ি দৌড়ে-লাফিয়ে পালাতে পারে। যেমন হরিণ। এই ধরনের প্রাণীদের পোষার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিতে পারে।

পালিত প্রাণীর ধরন

রোকেয়া জিজ্ঞেস করল— আমাদের পাশের বাড়িতে রহমতচাচা হাঁস পোষেন। প্রতিদিন সকালে হাঁসগুলোকে বাড়ির পাশের পুকুরে ছেড়ে দিতে আসেন। সারাদিন হাঁসগুলো জলে খেলা করে বেড়ায়। বিকেলে কেউ গিয়ে তাদের বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। কেউ আনতে না গেলে অনেকসময় তারা নিজেরাই বাড়ি ফিরে আসে। দিদি, এটাও কি পশুপালন?

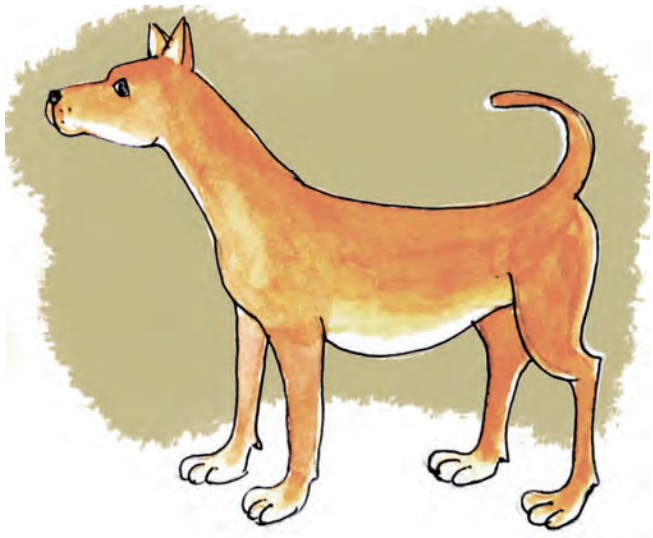

দিদিমণি বললেন— ঠিকই বুঝেছ। এটা এক ধরনের পশুপালন। মানুষ দেখল, কোনো কোনো পশুকে নিজেদের সঙ্গে রাখলে চাষের সুবিধা হয়, নানা পুষ্টিকর খাদ্য পাওয়া যায়। কেউ কেউ আবার অন্য হিংস্র প্রাণীদেরও দূরে সরিয়ে রাখে। তাই এদের পালন করলে

জীবনযাত্রা অনেক সহজ হয়। শুরু হলো পশুপালন। জানা যায় কুকুরকেই মানুষ প্রথম পোশ মানিয়েছিল, তারপর নানা ধরনের প্রাণী মানুষের বশ মেনেছে।

এবার তোমরা আলোচনা করে লিখে ফেলো।

পালিত প্রাণীর নাম	কী ধরনের প্রাণী			
	গবাদিপশু	পাখি	পতঙ্গ	অন্যান্য প্রাণী
১। গোরু				
২। শুয়োর				
৩। ভেড়া				
৪। মুরগি, হাঁস				
৫। কুকুর				
৬। মৌমাছি				
৭। উট				

রকমফেরে রান্নাবান্না আর খাওয়াদাওয়া

নীচের ছবিগুলোতে থাকা খাবারগুলো তোমরা কোনো না কোনো সময় হয়তো খেয়েছ বা দেখেছ। ছবির নীচে খাবারের নামগুলো লেখো—

রানি বলল — দিদি, একটা সমাজে সবাই কি একই খাবার খায়?

দিদিমণি বললেন — সবসময় তা হয় না। আমরা কী খাব তা ঠিক করে আমাদের অঞ্চলের পরিবেশ ও প্রকৃতি। ধরো,পশ্চিমবঙ্গের মানুষের প্রধান খাবার হলো ভাত। এখানকার মাটিতে অনেকদিন ধরে নানারকম ধানের চাষ হতো। আবার পাঞ্জাবে জোয়ার গম আর বাজরার চাষ বেশি হয়। তাই এক এক অঞ্চলের মানুষের খাদ্যতালিকাতেও এত পার্থক্য। তবে আজকাল মানুষ নানা রাজ্যের খাদ্য খেতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। আমাদের বাড়িগুলোতেও তাই প্রতিদিনই নানারকম রান্না হচ্ছে।

অরুণ ওর ঠাকুরমার কাছে শুনেছে চাল থেকে শুধু যে ভাত হয় তা নয়। বহু আগে থেকেই মানুষ চাল থেকে নানাধরনের খাবার তৈরি করতে শিখেছিল। বিশেষ বিশেষ উৎসবের দিন আবার বিশেষ বিশেষ ধরনের খাবার তৈরি হতো।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে কী কী খাবার হয় তা নীচে লেখো।

উৎসবের নাম	ওই উৎসব উপলক্ষে তৈরি বিভিন্ন বিশেষ খাবারের নাম
১। নবান্ন	১।
২। ঈদ	২।
৩। বুদ্ধ পূর্ণিমা	৩।
৪। শারদোৎসব	৪।
৫। বড়োদিন	৫।
৬। টুসু	৬।
৭।	৭।

মৈরাং-এর দাদু ওকে বলেছিলেন— আগে ভাতের সঙ্গে কতরকম শাক-তরকারি রান্না করা হতো। নিম, শিম আর বেগুন দিয়ে শুক্তো। ফুলবড়ি আর আদার রস দিয়ে নটে শাক। বেথুয়া শাকের চচ্চড়ি। উচ্ছে দিয়ে মুগ ডাল। মিষ্টি

দিয়ে ছোলার ডালও রান্না হতো বহু বাড়িতে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এসব রান্না হারিয়ে যাচ্ছে। নতুন নতুন রান্নাও শিখছে মানুষ।

দিদি বললেন — রান্না করাও কিন্তু একটা শেখার কাজ। কত পরীক্ষা করে তবে একটা রান্না হয়। সেই পুরোনো দিন থেকেই এক সমাজ অন্য সমাজের থেকে রান্না শিখে আসছে। ধরো, আমরা সবসময় ডাল খেতাম না। আবার পাঁচ- ছশো বছর আগে আলু পড়ত না আমাদের তরকারিতে। এক এক অঞ্চলের মানুষের থেকে এসব খাবার পেয়েছি আমরা।

পলাশ বলল — দিদি, আমাদের থেকে কেউ কিছু খাবার খেতে শেখেনি?

— হ্যাঁ। শিখেছে। রান্নায় নানারকম মশলা ব্যবহার হয়। ভারতের মশলা একসময় গোটা পৃথিবীতে বিক্রি হতো। তারপর ধরো মাছ। নানারকমের মিষ্টি। যেমন - রসগোল্লা, সরভাজা আর সরপুরিয়া এসব আমাদের রাজ্যে এক একটা অঞ্চলে বানানো হয়। এদের স্বাদেরও অনেক পার্থক্য আছে। পৃথিবীর নানা জায়গায় এদের বিক্রির জন্য পাঠানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জায়গা নীচের মিষ্টিগুলি তৈরি হওয়ার জন্য বিখ্যাত। শিক্ষক/শিক্ষিকার সঙ্গে আলোচনা করে নীচে লেখো।

মিষ্টির নাম	জায়গার নাম	জেলার নাম
১. সরভাজা / সরপুরিয়া		
২. ল্যাংচা		
৩. নতুনগুড়ের মোয়া		
৪. স্পঞ্জ রসগোল্লা		
৫. মিহিদানা		
৬. প্যাঁড়া		
৭. রসগোল্লা		
৮. মনোহরা		
৯. সীতাভোগ		

রেহানার বাড়ির চারদিকে ছোটো-বড়ো কত পুকুর। ছিপ ফেলে বা জাল দিয়ে ওর আব্বা ও চাচারা প্রতিদিনই মাছ ধরে নিয়ে আসে বাড়িতে। খাল-বিল-নদীনালায় ভরা রেহানাদের এই অঞ্চলে ভাতের সঙ্গে নানাধরনের মাছ খাওয়ার রুচি বহু শত বছর ধরে চলে আসছে। তবে এক এক জেলায় বিশেষ বিশেষ মাছের তৈরি রান্না খেতে মানুষ বেশি পছন্দ করে।

এবার তুমি বাড়ির বড়োদের সঙ্গে এবং শিক্ষিকা/শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করে নীচে লেখো।

বিভিন্ন রকমের মাছের নাম	ওই মাছ দিয়ে কী কী ধরনের খাবার তুমি খাও	কোন জেলায় মাছের ওই খাবার বেশি প্রচলন দেখা যায়
১। চিতল	১, ..., ২ ....., ৩.....	
২। রুই	১, ..., ২ ....., ৩.....	
৩। মৌরলা	১, ..., ২ ....., ৩.....	

বিভিন্ন রকমের মাছের নাম	ওই মাছ দিয়ে কী কী ধরনের খাবার তুমি খাও	কোন জেলায় মাছের ওই খাবার বেশি প্রচলন দেখা যায়
৪। কই	১, ..., ২ ....., ৩....	
৫। বোরোলি	১, ..., ২ ....., ৩....	
৬। ইলিশ	১, ..., ২ ....., ৩....	
৭। পাবদা	১, ..., ২ ....., ৩....	
৮। পমফ্রেট	১, ..., ২ ....., ৩....	

— আমাদের খাদ্যের মধ্যে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো নানা ধরনের পানীয়। দুধ অত্যন্ত পুষ্টিকর পানীয়। শরবত, এছাড়াও নুন মেশানো লেবুর জল, দইয়ের ঘোল, আমের শরবত এগুলো আমরা প্রধানত গরমকালে পান করি। আর চা পান করা আমরা চিন দেশ থেকে শিখেছি।

খাদ্যের মধ্যে দিয়ে এক সমাজের ছাপ আর এক সমাজে চলে যায়।

ঋষি একবার এক নিমন্ত্রণ বাড়িতে গিয়ে দেখেছিল যে মানুষ যত পরিমাণ খাদ্য নেয় ততটা খায় না। অধিকাংশ খাদ্যই নষ্ট হয়। এ দেখে ওর খুব কষ্ট হয়েছিল। কত মানুষ প্রতিদিন খাবার পায় না। অপুষ্টিতে ভুগে আমাদের মতো কত শিশু প্রতিদিন মারা যায়। উৎসব উপলক্ষে খাবারের অপচয় না করাই উচিত।

দিদিমণি বললেন — এব্যাপারে সমাজের সব মানুষেরই সচেতন হওয়া প্রয়োজন। এবিষয়ে তোমরা একটি পোস্টার তৈরি করো ।

খাবার যেভাবে ছড়িয়ে পড়ল

মৈরাং বলল — দিদি, সবসময় কি মানুষ খাবার নষ্ট করত?

দিদিমণি বললেন — না। ঠিক তা নয়। একসময় মানুষ খাবার বাঁচাবার উপায়ই জানত না। ধরো, সকলে মিলে একটা বড়ো পশু শিকার করেছে। সবার খাবার পরেও অনেকটা পড়ে রইল।

রানি বলল — তখন তো আর ফ্রিজ বা হিমঘর ছিল না। তাহলে কী করত ওই বাড়তি খাবার নিয়ে?

— বাড়তি খাবার তখন নষ্ট হতো।

রহমান বলল — অন্যদের দিয়ে দিত না?

— তখন এখনকার মতো দেওয়া-নেওয়া বা বেচাকেনার ধারণাই ছিল না। আর যাতায়াত ব্যবস্থাও আজকের মতো ছিল না। তাই বাড়তি খাবার পচে নষ্ট হতো। অনেক সময় অন্য জন্তুরাও ওই পড়ে থাকা খাবার খেয়ে নিত।

সোহেল বলল --- তাহলে কবে মানুষ খাবার দেওয়া-নেওয়া করতে শিখল?

— যখন কৃষিকাজ শুরু হলো তখন অবস্থাটা বদলে গেল। প্রথমে নিজেদের যতটুকু দরকার ততটুকু খাবারই জোগাড় করত মানুষ। পরে আস্তে আস্তে বাড়তি খাবার তৈরি হতে থাকে। পাশাপাশি সমাজে নানারকম খাবারের চাহিদাও তৈরি হয়। কিন্তু সব অঞ্চলে সব খাবার পাওয়াও যেত না।

তোমাদের বাড়ির কাছের হাটেবাজারে যে সমস্ত খাবার জিনিস বিক্রি হয় তাদের নাম নীচে লেখো। বড়োদের সাহায্য নিয়ে জানার চেষ্টা করো কোন কোন জায়গা থেকে সেগুলো হাটেবাজারে আসে ।

কীরকম খাদ্য	খাদ্যের নাম	কোন কোন জায়গা থেকে আসছে
খাদ্যশস্য		
শাকসবজি		
মাছ, মাংস, ডিম		
ফল		

রহমান বলল— ওপরের তালিকা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে যেসব খাবার আমাদের রোজই লাগে, তার অনেক কিছুই অন্য জায়গা থেকে আসে। এভাবেই কি তাহলে আগের দিনে এক জায়গার সঙ্গে অন্য জায়গার খাবার লেনদেন হতো?

দিদিমণি বললেন— হ্যাঁ। ধরো, চাষি ধান চাষ করে। আবার জেলেরা মাছ ধরে। আবার আমার মতো যারা চাকরি করে তারা চাষও করে না, মাছও ধরে না। অথচ চাষি, জেলে এবং আমি মাছ-ভাত দুই-ই খাই। এটা কীভাবে হয়?

সনৎ বলল — চাষি জেলেকে চাল দেবেন। বদলে জেলে চাষিকে মাছ দেবেন। আর আপনি চাষি ও জেলের কাছ থেকে চাল ও মাছ হাটবাজার থেকে কিনে নেবেন।

করিম বলল --- এভাবেই তো সমাজে খাদ্যের দেওয়া-নেওয়া শুরু হয়ে গেল।

মথন বলল --- এখানে বিনিময় ছাড়া খাদ্য নিয়ে বেচাকেনাও তো হলো দিদি।

— হ্যাঁ। হলোই তো। একেবারে শুরুর দিকে মানুষ বেচাকেনা করত না। তখন দেওয়া-নেওয়া করত। তারপর একসময় বেচাকেনা শিখল। তখন আর চালের বদলে মাছ না নিলেও চলত। বাড়তি চাল বিক্রি করে টাকা পাওয়া যেত। সেই টাকায় চাষি কিনত কাপড়। আবার জেলেও বাড়তি মাছ বিক্রির টাকায় হয়তো কিনত গম বা শাকসবজি। এভাবেই একসময় খাবারের বাজার তৈরি হলো।

— আমাদের গঞ্জে সপ্তাহে দু-দিন হাট বসে। গাড়ি করে, ঝুড়িতে বা মাথায় বস্তা চাপিয়ে অনেক লোক নানা জিনিস

নিয়ে আসে। সারাদিন বেচাকেনা চলে আমরাও মাঝেমধ্যে বড়োদের সঙ্গে হাটে যাই।

দিদিমণি বললেন --- তাহলে দেখো বাড়তি খাবার দেওয়া-নেওয়া থেকে কত কিছু হলো। ব্যবসাবাণিজ্য শুরু হলো। তার পাশাপাশি এক অঞ্চলের সঙ্গে আর এক অঞ্চলের যোগাযোগ তৈরি হলো। বাড়তি খাবার নষ্ট হওয়ার পরিমাণও কমতে লাগল।

করিম বলল — যাদের খাবার কেনার পয়সা নেই তারা কী করে খাবার পাবে?

তুলি বলল — মরুভূমি অঞ্চলে জল নেই। চাষবাসও ভালো হয় না। সেখানকার লোক কীভাবে খাবার পায়?

--- রেশন দোকান থেকে অল্পদামে চাল, গম দেওয়া হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে বিনে পয়সায় খাবার দেওয়া হয়। আর মরুভূমির আশেপাশে কম বৃষ্টিতে কোনো কোনো ফসল ভালো হয়। আবার যেগুলোর চাষ একদমই হয় না সেগুলো বাইরে থেকে আনতে হয়। এতে খাবার জিনিসের দাম অনেক বেড়ে যায়। পাহাড়েও এজন্য খাবারের দাম অনেক বেশি। এভাবেই এক সমাজের বাড়তি খাবার আবার আর এক সমাজের কাজে লাগে।

খাবার জমিয়ে রাখা

ইস্কুলে এসে যেই না বসতে যাবে, টুবাই দেখতে পেল কাণ্ডটা। খুদে খুদে লাল পিঁপড়েরা তাদের থেকে অনেক ভারী এমন সব খাবারের টুকরো বয়ে নিয়ে চলেছে। কোথায় যাচ্ছে তারা?

টুবাইয়ের পাশে ইমরান, রেবা আর আয়েষাও এসে হাজির হলো। তারা দেখল সব পিঁপড়ে আবার একা নয়; অনেকে মিলে খাবারের একটু বড়ো টুকরোও বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর ঢুকে পড়ছে দরজার কোণে একটা গর্তের মধ্যে।

এমন সময় দিদিমণি ক্লাসে ঢুকলেন। সবাই হুড়োহুড়ি করে যে যার জায়গায় বসে পড়ল।

ভালো করে জায়গাটা লক্ষ করে দিদিমণি বললেন — ওঃ এই ব্যাপার। আস্তে আস্তে গরম বাড়ছে তো। এরপরই বর্ষাকাল। তাই পিঁপড়েরা খাবার জমাতে শুরু করেছে তাদের বাসায়।

রেবা বলল— আমাদের বাড়ির ধানের গোলা থেকে মাঝে মাঝে ইঁদুর বেরোয়। ওরাও ধান নিয়ে গিয়ে জমা করে নিজেদের গর্তে।

আয়েষা বলল— আমাদের আমগাছে যে মৌচাকটা হয়েছে, তাতে মৌমাছিরা সারাদিনই ফুল থেকে মধু এনে জমা করছে।

গোকুল বলল— আমি টিভিতে দেখেছি, বাঘ বড়ো জন্তু শিকার করে যতটা পারল খেল। আর বাকিটার পাশে শুয়ে বসে পাহারা দিচ্ছে।

দিদিমণি বললেন — তাহলে ভাবো আমাদের চেনা প্রাণীদের অনেকেই কেমন বিভিন্নভাবে খাবার জমিয়ে রাখে।

প্রাণীর নাম	কীভাবে খাবার জমিয়ে রাখে
মুরগি	
আরশোলা	

ইমরান বলল— দিদি, গাছও কী এরকম খাবার জমিয়ে রাখতে পারে?

দিদিমণি বললেন — গাছেরাও তাদের বিভিন্ন জায়গায় খাবার জমা করে। মানুষ শুরুর দিকে ছিল যাযাবর। জল বা খাবার জমিয়ে রাখতে পারত না। তারপর একসময় চাষ করা শিখল।

ইমরান বলল— চাষ করার ফলে অনেক ধান, গম বা অন্যান্য শস্য হতো। সেগুলো রাখত কোথায়?

বিনয় বলল — মাংস জমিয়ে রাখা যায় না। পচে যায়।

— কিন্তু ধান, গম বা অন্য শস্য অনেকদিন ভালো থাকে। প্রথমদিকে মাটিতে গর্ত করে বা পাথরের এবড়ো-খেবড়ো পাত্রে রাখত। তারপর ঝুড়ির গায়ে মাটি লেপে বা মাটির

রিং তৈরি করে পাত্র বানাতে শিখল। রোদে পুড়িয়ে শক্ত করে নিত।

ইমরান বলল— কিন্তু জল, দুধ রাখা তো কঠিন। মাটি গলে যেতে পারে।

কোয়েল বলল — এজন্যই কি মানুষ মাথা খাটিয়ে আগুনে মাটি পোড়াতে শিখেছিল?

--- বিভিন্ন সময়ে তাদের অভিজ্ঞতা হয়েছিল যে পোড়ামাটি জলে গুলে যায় না। তাই জল ধরে রাখার জন্যে তারা পোড়ামাটির পাত্র বানিয়েছিল।

রেবা জিজ্ঞাসা করল— তামা, লোহার ব্যবহার জানার পর মানুষ ধাতুর পাত্রও তৈরি করেছিল। তাতেও কি খাবার রাখত?

— ঠিক তাই। তবে যতদিন যাচ্ছিল লোকসংখ্যা ততই বাড়ছিল। মানুষ চাষের জমিও বাড়ানোর চেষ্টা করেছিল। ফলে মানুষের হাতে একসময় প্রচুর ফসল এসেছিল। এত ফসল কোথায় রাখা যেতে পারে?

রহমান বলল — আব্বা বলেন আমাদের গ্রামে আগে নাকি প্রতি বছরই বন্যা হতো। জমির ফসল ক্ষেতেই নষ্ট হয়ে যেত। সেই খারাপ দিনের জন্য আব্বার দাদু বাড়িতে ধানের গোলা বানিয়েছিলেন।

বাড়ির বড়োদের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করো তোমাদের বাড়িতে কোন কোন খাদ্য আগেও রাখা হতো। আর লক্ষ করো সেগুলো এখন কীভাবে রাখা হয়।

কোন খাদ্য বা পানীয় জল	এখন কীভাবে রাখা হয়	আগে কীভাবে রাখা হতো

— প্রাচীন ভারতেও খাবার জমিয়ে রাখত মানুষ। খাবার জমিয়ে রাখার নানান ব্যবস্থা তাদের জানা ছিল।

ইমরান বলল— গোলায় নতুন ধান রাখার আগে গোলা থেকে পুরোনো ধান সব বের করা হয়। তারপর ভালো করে পরিষ্কার করে তবে নতুন ধান ভরা হয়।

--- এটাও নিশ্চয়ই দেখা হয় যাতে তার মধ্যে হাওয়া-আলো যথেষ্ট যাতায়াত করতে পারে। কেন বলোতো? যাতে স্যাঁতস্যাঁতে না হয়।

রেবা জিজ্ঞাসা করল— শহরে কোথায় রাখা হয় এসব জিনিস?

ইমরান বলল— শহরে বড়ো বড়ো গুদাম আছে তার জন্য। কিছু কিছু গুদামের ভেতরটা ফ্রিজের মতো ঠান্ডা। আলু রাখার জন্যে বর্ধমান ও হুগলি জেলায় এরকম অনেক হিমঘর আছে। কাকারা ওই হিমঘরে আলু রাখেন।

দিদিমণি বললেন — আলু তাতে অনেকদিন ভালো থাকে। অন্য সবজি রাখার এরকম ব্যবস্থাও আছে। আমাদের অনেকের বাড়িতে বা দোকানের ফ্রিজেও তো অনেক জিনিস রাখা হয় একই কারণে।

তোমাদের বাড়িতে নীচের জিনিসগুলো কীভাবে রাখা হয় জানার চেষ্টা করো। লেখো অথবা টিক '✓' চিহ্ন দিয়ে বোঝাও।

কী জিনিস	কোনটা কয়েকঘণ্টা ভালো থাকে	কোনটা কয়েকদিন ভালো থাকে	কোনটা দীর্ঘদিন ভালো থাকে	বাড়িতে জিনিসগুলো কীভাবে রাখা হয়
চাল				নিমপাতা, কারিপাতা শুকিয়ে মেশানো হয়।
চিনি				
আলু				
মাছ				

একই খাবার নানা রূপে ও স্বাদে

আয়েষা বলল--- এবছর অনেক আম হয়েছে তো আমাদের গাছে। তাই ঠাকুমা কাঁচা আম টুকরো করে কেটে তাতে নুন-হলুদ মাখিয়েছে। আর রোজ রোদে দিচ্ছে।

রেবা বলল— অনেকদিন ধরে রোদে দিলে আম শুকিয়ে যাবে।

ইমরান বলল — শুকনো আম অনেকদিন ভালো থাকবে, তাই না?

দিদিমণি বললেন— যে-কোনো জিনিসে জল কম থাকলে তা অনেকদিন ভালো থাকে। এটা অনেক হাজার বছর আগেই মানুষ বুঝেছিল।

ইমরান জিজ্ঞেসা করল— তার মানে প্রাচীনকালেও মানুষ এভাবে শুকনো করত খাবার জিনিস?

দিদিমণি বললেন— তখনকার দিনেও সবজি বা ফল রোদে বা বাতাসে শুকনো করা হতো। রোমানরা এরকম শুকনো করা ফল ভালোবাসত। প্রাচীনকালে মানুষ মাছ-মাংসও শুকনো করে রাখত।

— তখনকার মানুষ তাহলে সূর্যের তাপকে ব্যবহার করা জানত।

— কিন্তু সব জায়গায় বা সব ঋতুতে রোদের তেজ সমান হয় না। পুরোনো দিনের মানুষ তাহলে অন্যভাবেও মাছ-মাংস রাখার কথা ভেবেছিল?

— আগুনে সেঁকে বা গরম ধোঁয়ায় শুকনো করে মাংস রাখা শুরু হয়েছিল অনেকদিন আগেই। বাড়িতে মাছ-মাংস রান্না করা দেখেছ। কীভাবে করা হয়?

— প্রথমে নুন-হলুদ মাখিয়ে সেগুলো রেখে দেওয়া হয়। এতে বেশ খানিকটা জল বেরিয়ে আসে মাছ-মাংস থেকে।

— ঠিক তাই। এজন্যেই মাছ-মাংস পাতলা করে কেটে নুন মাখিয়ে শুকনো করা হতো। তারপর রাখা হতো মাটির বা অন্য পাত্রে। এখন দেখবে বাজারে নুন মাখানো শুঁটকিমাছ বিক্রি হয়।

— নুন মাখিয়ে রাখলে মাছ-মাংস ভালো থাকে কেন?

— জীবাণু থেকে খাবারকে বাঁচায় নুন। অভিজ্ঞতা থেকেই মানুষ বুঝেছিল নুনের মতো মধু, ঘি বা তেলও জীবাণুর হাত থেকে খাবারকে বাঁচায়। তাই আগেকার দিনে মধুতে ডুবিয়ে রাখা হতো ফলমূল।

মা, ঠাকুমা বা দিদিমার কাছ থেকে জানার চেষ্টা করো নীচের জিনিসগুলো কীভাবে অনেকদিন ভালো রাখা যেতে পারে :

কী জিনিস	কীভাবে অনেকদিন ভালো রাখা যায়
নোনা জলের মাছ	
বাঁধাকপি	
চাল	
টম্যাটো	

— আমাদের দেশের লোকেরা জানত না এভাবে খাবার রাখার কথা?

— শুকিয়ে রাখার কথা জানাই ছিল। এছাড়া অনেকরকম ছোটো গুল্ম মেশানো জারক রসও তৈরি হয়েছিল আমাদের দেশে।

— আচার-কাসুন্দি মাঝে মধ্যেই রোদে দেয় ঠাকুমা। তবে নাকি ওগুলো অনেকদিন ভালো থাকে!

— এভাবে জিনিসগুলোর মধ্যে বাতাস থেকে ঢুকে পড়া জল কমে যায়।

—তাছাড়া বাতাসে ভেসে থাকা জীবাণুরা তো আছেই। তাদের তো খালি চোখে দেখতে পাওয়া যায় না। সেগুলো কি আমাদের চোখের আড়ালেই ঢুকে পড়ে খাবারে?

— শুধু যে ঢুকে পড়ে তা নয় , সেখানে নিজেদের সংখ্যাও বাড়ায়। একসময় খাবারটাকেই নষ্ট করে ফেলে।

— এই জীবাণুর হাত থেকেও তাহলে খাবারকে বাঁচাতে হবে।

— কাঁচা জিনিস থেকে পচে যেতে পারে এমন অংশ বাদ দেওয়া হয় অনেকসময়।

—আমি দেখেছি, বাড়িতে কুমড়োর দানা বা ভিতরের অংশটা প্রথমেই ফেলে দেওয়া হয়। কাঁচা লঙ্কার বোঁটা ফেলে দেওয়া হয়।

— বাজারে বড়ো মাছের মাথা আর কাটা বিক্রি হয়। বড়ো চিংড়িরও মাথা বিক্রি হয়, দেহটা থাকে না। দেহটা কোথায় যায়?

— দেহটা খুব ঠান্ডা অবস্থায় প্যাকেটে বা বাক্সে বন্দি করা হয়। যাতে অনেকদিন একইরকম থাকে।

— আর প্যাকেটের আলুভাজা যে অনেকদিন ভালো থাকে?

রমা বলল — বাতাস ঢুকতে পারবে না এমন প্যাকেট বা বাক্সে খাবার অনেকদিন ভালো থাকে। তাছাড়া ভাজা জিনিসও অনেকদিন ভালো থাকতে পারে। বাড়িতে দেখেছি অনেকসময়ই কাঁচা মাছ রাখা যায় না বলে ভেজে রাখা হয়। যদি কোনো তরল বা জলসুদ্ধ খাবার রাখতে হয়, তখন কী করা হয়?

নরেন বলল — প্যাকেটের ফলের রস আমি খেয়েছি। বোতলেও বিক্রি হয়।

দিদিমণি বললেন — তরলযুক্ত খাবার বিশেষ ধরনের কাগজের প্যাকেটে বা টিনে রাখা হয়। বায়ুশূন্য অবস্থায়। যারা অনেকদিনের জন্যে সমুদ্র যাত্রায় যায় বা পাহাড়ে চড়েন , তারাও টিনের খাবার সঙ্গে নিয়ে যান।

— মহাকাশে যাবার সময়েও কি সুনীতা উইলিয়ামস এরকম খাবার নিয়ে গিয়েছিলেন ? খাবারের গুণ কি সবই ঠিক ছিল ?

দিদিমণি বললেন— প্যাকেটে, বোতল বা টিনবন্দি খাবারে অনেকরকম পদার্থ মেশানো হয়। যেগুলো বেশ কিছু দিন তাদের খাদ্যগুণ বজায় রাখতে সাহায্য করে। তোমরা জানো, টিনবন্দি রসগোল্লাও এভাবে এদেশ থেকে বিদেশে পাঠানো হয়।

তোমার জানা প্যাকেট, বোতল বা টিনবন্দি এরকম তিনটি করে খাবারের নাম লেখো।

খাবারের নাম	কী খাবার	কোথায় পাওয়া যায়

মাটি আর নেইকো খাঁটি

রসুলদের গ্রামটা বেশ সুন্দর। সবারই কিছু না কিছু জমি আছে। চাষবাস করে। বছরের খাবার পেয়েই যায়। মাঠ একদম সবুজ। কেনই বা হবে না। পাশেই তো নদী। সারাবছর জলের অভাব হয় না। তাই নানারকম ফসল হতো। একদিন শুনেছিল ওদের পাশের গ্রামে একটা কারখানা হবে। ঠান্ডা পানীয় জল তৈরির কারখানা। রসুল ভেবেছিল, বাঃ বেশ ঠান্ডা জল খাওয়া যাবে, আর অনেকে কাজ পাবে। কিন্তু বছর দুয়েক পর সব কিছু কেমন যেন হয়ে যেতে লাগল এর ফলে নদীর জল কমে যেতে

লাগল। ওদের গ্রামের পুকুরের মাছ মরে ভেসে উঠতে লাগল। ফসলের পরিমাণ কমে গেল। মাটিতে নানা বিষ মিশতে লাগল কারখানার নোংরা জল থেকে। নানা ধরনের অসুখে ভুগতে লাগল গ্রামের মানুষ। সবাই খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল।

বন্ধুদের সাথে আলোচনা করে নীচে লিখে ফেলো :

কী ছিল	এখন কী হয়েছে	কেন এমন হলো
রসুলদের গ্রামের জমিতে নানারকম ফসল হতো।		
ফসলের পরিমাণ কমে গেছে		
জমির ফসল নষ্ট হয়ে গেছে।		
গ্রামের মানুষ নদীকে ব্যবহার করতে পারছে না।		

রসুল বলল— আজকাল নদীর জল নোংরা হয়ে যাচ্ছে কেন?

দিদিমণি বললেন— জল কমে যাওয়া একটা কারণ তো বটেই। নদীর জল নষ্ট হওয়ার আর কী কী কারণ হতে পারে বলে মনে করো?

দিদিমণি আরও বললেন— নদীর জল ছাড়াও নানা কারণে মাটিও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

মাটি কী কী কারণে নষ্ট হয়ে যায় তা বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

মাটি খারাপের ফলে যা যা হয়	কী কী কারণে মাটি খারাপ হয়ে যায়
মাটির ফসল তৈরির ক্ষমতা কমে যাওয়া	
মাটির ওপরটা নষ্ট হয়ে যাওয়া	
মাটিতে জল জমে থাকা	

রসুল বলল— তাহলে কি কারখানাটা না হলেই ভালো হতো?

দিদিমণি বললেন— কারখানা হলে আমাদের ভালোই হয়। অনেকে কাজ পায়। কিন্তু যাঁরা কারখানা চালাবেন তাঁদের কাজ হলো চারপাশের মাটি, জল, বাতাস যাতে খারাপ না হয় সেদিকে নজর রাখা।

বাড়ির পাশের মাঠটা

বাবলি, কৌশিকি,অমিতাভদের পাড়ার ছোট্ট মাঠটা বেশ সুন্দর। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। একদিন শোনে ওখানে নাকি অনেক বাড়ি হবে। তাই ওদের ভীষণ মন খারাপ। স্কুলে যাওয়ার সময় ওরা মাঠে অনেক লোক দেখল। সব

কোদাল, হাতুড়ি, করাত নিয়ে নানা কাজ করছে। কেউ মাটি কোপাচ্ছে। কেউ গাছ কাটছে। কেউ আবার পাঁচিল ভাঙছে। চারপাশে ভীষণ ধুলো। শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। নাকে রুমাল দিয়ে কোনোরকমে ওরা মাঠটাকে পেরিয়ে যায়। কিছুদিন পর দেখল মাঠের পাশে একটা ডাস্টবিন হয়েছে। সবাই নোংরা ফেলছে। এদিকে মাঠে বাড়ি তৈরির কাজ পুরোদমে চলছে। এখন ওদের বাড়ির জানালাগুলো বন্ধ রাখতে হয়। যা ধুলো আর তার সঙ্গে গন্ধ! গা গুলিয়ে ওঠে। একদিন বাবলিরা ঠিক করল ওখানে গাছ বসাবে। কিন্তু বসাবেই বা কোথায়। চারিদিকেই তো জঞ্জাল। একটু ফাঁকা জায়গা পেয়ে ওরা একটা জবা গাছ বসাল। পালা করে জল দিত ওরা। কিন্তু গাছটা বাঁচল

না। অমিতাভর বাবা বলেছিলেন— আসলে ওখানকার মাটিটাই খারাপ হয়ে গেছে। কৌশিকি বলল— মাটিটা খারাপ হলো কী করে? অমিতাভর বাবা বললেন— মাটির কণা জলে ধুয়ে বেরিয়ে গেলে মাটি খারাপ হয়। আবার মাটিতে যা মেশার কথা নয় তা যদি মাটিতে মেশে তাতেও মাটি খারাপ হয়।

পরের দিন মাটি খারাপ হয়ে যাচ্ছে এই নিয়ে ক্লাসে আলোচনা হচ্ছিল।

দিদিমণি বললেন— আমাদের চারপাশে নানাভাবে মাটি নোংরা হচ্ছে। নষ্ট হয়ে যাচ্ছে মাটির গুণ। বেশি ফসল ফলানোর জন্য মাটিতে দেওয়া হয় নানান সার। বেশি বেশি রাসায়নিক সার দিলে তা'ও মাটিকে বিষিয়ে দিতে

পারে। মাটিতে ছড়িয়ে পড়া বিষে শেষ হয়ে যাচ্ছে অসংখ্য প্রাণী।

তোমরা দেখো তো তোমাদের চারপাশের মাটি কীভাবে খারাপ হচ্ছে? বন্ধুদের নিয়ে আলোচনা করে নীচে লেখো:

তোমার চারপাশের মাটি	মাটিতে কী কী মিশে যাচ্ছে
বাড়ির চারপাশের মাটি	
খেলার মাঠের মাটি	
বাজারের চারপাশের মাটি	

জলই আমাদের জীবন দেয়

নীচের ছবিগুলো মন দিয়ে দেখো। আমাদের জীবনে জলের নানা ব্যবহারের ছবি। ফাঁকা বাক্সগুলোতে জলের ব্যবহারগুলো লেখো।

আধুনিক সভ্যতা ও পরিবেশের সংরক্ষণ

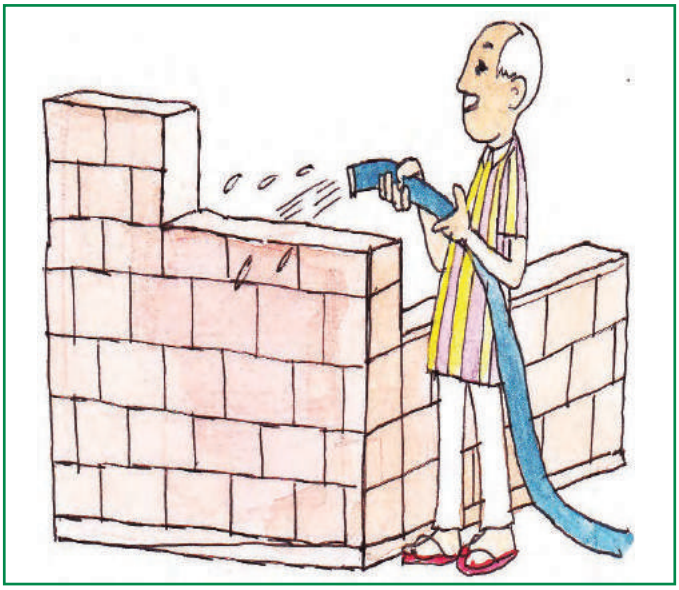

জল ছাড়া বাঁচব কী করে?

সেবার কী কষ্ট। একটুও বৃষ্টি নেই। মাটি একেবারে ফুটিফাটা। চাষের জল নেই। পুকুরও শুকিয়ে গেছে। গোটা গ্রাম জুড়ে জলের হাহাকার। জলের জন্য মানুষ কত হাঁটছে। প্রায় ৬-৭ মাইল হেঁটে গেলে একটা মাত্র কুয়ো। সেখানে কিছুটা জল আছে। সবাই সেখানেই যায় খাবার জলের জন্য। আর কিছুদিন বৃষ্টি না হলে কী যে হবে। না, বেশিদিন অপেক্ষা করতে হলো না। তিনদিনের মধ্যেই আকাশের কোণে কালো মেঘ দেখা দিল।

ওপরের গল্পটি পড়ো। তারপর নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নীচের কাজটি করে ফেলো।

তোমরা কী কী কাজে জল ব্যবহার করো	ওই কাজের জল তোমরা কোথা থেকে পাও
১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	
৬.	
৭.	

জল নোংরা করি আমরাই

নীচের ছবিটি মন দিয়ে দেখো। আমরা নানাভাবেই জল নোংরা করি, তার ছবি। আর কীভাবে আমরা জল নোংরা করি তা লেখো।

.....

.....

.....

.....

গ্রামের পাশের খালটা

মাধোপুর গ্রামে রূপা-রা কয়েকপুরুষ ধরে থাকে। ওদের বাড়িটা অনেকটা জায়গা জুড়ে। আর হবে নাই বা কেন। জ্যাঠা, কাকাদের নিয়ে ওদের বারো ঘর এক উঠোন। ওদের বাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে একটা খাল। কিছু দূর গিয়ে নদীতে মিশেছে। তবে তেমন জল নেই। তিরতির করে জল বয়। আর জল যাবেই বা কী করে। খালের মধ্যে কত প্লাস্টিক বোতল, প্যাকেট সব ভাসছে। জল যাওয়ার রাস্তাই নেই। একদিন সন্ধ্যাবেলা ঠাকুরদাদার কাছে রূপা, জিতেন, অনিমারা গল্প শুনছিল। ঠাকুরদাদা বললেন—

জানিস আগে এই খালে কত জল থাকত। খালের ওপাশে তো পুরোটাই চাষের জমি । আর জমি চাষে সব জলই

নেওয়া হতো এই খাল থেকে। এখন তো খালটা মজে গিয়েছে। রূপা জিজ্ঞেস করল - কী করে দাদু?

— এর জন্যে আমরাই দায়ী। জিতেন বলে উঠল— আমরা? দাদু বললেন— হ্যাঁ। আমরা। আমরা বাড়ির যাবতীয় নোংরা খালে ফেলেছি। দিনের পর দিন। অনিমা বলল— তাই খালে এত প্লাস্টিক, এত আবর্জনা। রূপা বলল— আচ্ছা দাদু, খালে তো মাছও বাঁচে না। দাদু বললেন— ঠিক বলেছ দিদি। বাঁচবেই বা কী করে। আমরা জমিতে ভালো ফসল ফলাতে চাই। তাই পোকামারা বিষ দিই। সেই বিষ জলে গুলে যায়। নালা দিয়ে খালে এসে পড়ে। খালের জল বিষাক্ত হয়ে যায়। আর সব মাছ মরে যায়। জিতেন বলল— দাদু ,একটু বৃষ্টি হলেই তো গ্রামে জল জমে যায়। জল তো খাল দিয়ে নামতেই চায় না। খালটা তো মজেই গেছে। রূপা বলল— দাদু আমরা কী কিছু করতে পারি না? দাদু বললেন— চল কালকে আমরা স্কুলে যাব। স্যারদের সঙ্গে একটু আলোচনা করব। আমাদের এই খালটাকে আবর্জনামুক্ত করতেই হবে।

তোমাদের এলাকার খাল/বিল/ ভেড়ি/পুকুর/নদী দেখো। দেখোতো কী কী ধরনের আবর্জনা ফেলা হয়। সেগুলো যাতে না ফেলা হয় তার জন্য তোমরা কী করতে পারো তা লেখো।

কী ধরনের আবর্জনা ফেলা হয়েছে	আগে জল কতটা ছিল, জলের রং কেমন ছিল	এখন জল কতটা আছে, জলের রংই বা কেমন	আগে কত লোক জল ব্যবহার করত	এখন কত লোক জল ব্যবহার করে	ওই জল থেকে কোনো অসুখ হয়েছিল কিনা

বাতাসের ধুলো ধোঁয়া

তিন্নির কদিন থেকে বেশ কাশি। রাতের দিকে দমক বাড়ে। বুকের মধ্যে সাঁই সাঁই শব্দ। শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে স্কুল। হাঁটাপথেই যাওয়া যায়। তবে রাস্তায় বেশ গাড়ি রয়েছে। গাড়ির কালো ধোঁয়ায় ওর খুব কষ্ট হয়। হাঁটার সময় বেশ কিছু লোকের মুখে সিগারেট থাকে। ধোঁয়া ছাড়ে। ওরা বোঝে না যে এই ধোঁয়া তিন্নিকে কষ্ট দিচ্ছে। ওদের পাড়ার মোড়েই রয়েছে একটা ডাস্টবিন। বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে ইঁদুর মরা থেকে বাড়ির যাবতীয় নোংরা পচে গলে পড়ে রয়েছে। নিয়মিত পরিষ্কার হয় না। ওদের স্কুলের ঠিক আগে একটা সিমেন্টের গুদাম আর গাড়ি রং করার গ্যারেজ। সিমেন্টের ধুলো আর রঙের ফোঁটায় ওর দম আটকে যায়। রাস্তার

পাশে গাছগুলো সব কেটে ফেলেছে। সারি সারি সব দোকান। এ অবস্থা যে শুধু তিন্নির তা কিন্তু নয়, ওদের ক্লাসের তপন, নয়ন, আফসানাদেরও।

আমাদের চারপাশের বাতাস এরকমভাবেই নোংরা হয়ে যাচ্ছে। তোমাদের বাড়ির/স্কুলের চারপাশ কীভাবে খারাপ হচ্ছে তা লক্ষ করো।

কী থেকে খারাপ হচ্ছে	কী ধরনের বিষ বাতাসে আসছে
ইঞ্জিন লাগানো ভ্যানগাড়ি	কালো ধোঁয়া

জল, বায়ু ও মাটির দূষণ

ক্লাসে গ্রামের পরিবেশ নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। দিদিমণি বললেন— মানুষের জন্যেই বাতাস, জল এবং মাটি খারাপ হয়ে যাচ্ছে। মানুষের ব্যবহারের উপযোগী থাকছে না। এমন হলেই বাতাস, মাটি বা জলের দূষণ হয়েছে বলা হয়।

নীচের ছবিটি ভালো করে দেখো। কোথায় কোথায় পরিবেশ দূষিত হচ্ছে তা (টিক '✓' চিহ্ন দিয়ে) দেখাও। সেখানে কী দূষণ হচ্ছে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে পাশের ফাঁকা জায়গা পূরণ করো।

বাড়ির বড়োদের সঙ্গে কথা বলো। জানো, আগে তোমাদের গ্রাম/শহর/পাড়া কেমন ছিল। তারপর এখন কী অবস্থা। পাশাপাশি মেলাও।

তোমার গ্রাম, শহর বা পাড়ার নাম	আগে কী কী ধরনের নোংরা পাড়ার বা গ্রামের আশেপাশে ফেলা হতো	কোন কোন জায়গায় গাছপালা/ জঙ্গল ছিল	চাষের জমিতে কী দেওয়া হতো	আগে কী ধরনের যানবাহন ছিল	কী ধরনের কলকারখানা ছিল

তোমার গ্রাম, শহর বা পাড়ার নাম	এখন কী কী ধরনের নোংরা ফেলা হয়	এখন কোন কোন জায়গায় গাছপালা আছে	চাষের জমিতে কী দেওয়া হতো	এখন কী ধরনের যানবাহন চলে	কী ধরনের কলকারখানা ছিল

দূষিত জল বিষম ফল

ওপরের ছবিগুলির প্রকৃতি চিহ্নিত করো এবং এরা কোন কোন ধরনের জলের উৎসে মেশে তার সঙ্গে মেলাও :

বিভিন্ন প্রকারের দূষক	কোন ধরনের জলের উৎসে মেশে
১. গৃহস্থালির নানা বর্জ্য	১. নর্দমার জল
২. প্লাস্টিক	২. পুকুরের জল
৩. কারখানার বর্জ্য	৩. নদীর জল
৪. কৃষিক্ষেত্রের কীটনাশক	৪. সমুদ্রের জল
৫. লঞ্চ/জাহাজের তেল	৫. খালের জল
৬. কচুরিপানা	৬. মাটির নীচের জল

নীচের বক্তব্যগুলি লক্ষ করে কী কী সমস্যা হতে পারে লেখো :

এমন যদি হয়	কী কী সমস্যা হতে পারে
১.নোংরা জলে নিয়মিত স্নান করলে	
২.নোংরা পুকুরের জল পান করলে	
৩.কৃষিক্ষেত্রে সার বা কীটনাশক মাটির নীচের জলের সংস্পর্শে এলে	
৪.নোংরা জলে কাপড় কাচলে	

১. গাছের পাতার ওপর ধূলিকণা জমে যাওয়া

২. নোংরা বর্জ্য খেয়ে কাকের মৃত্যু

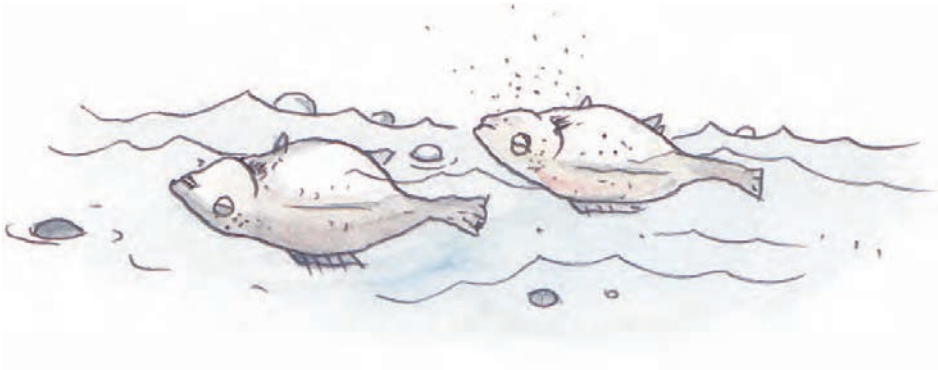

৩. পুকুরে মাছ মরে ভেসে ওঠা

৪. সৌধের গায়ে কালো ছোপ

ওপরের ছবিগুলোর বিষয়বস্তু চিহ্নিত করো ও তাদের সঙ্গে যুক্ত দূষণের প্রকৃতি চিহ্নিত করো। কীভাবে দূষণগুলি ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে তা নিজেরা আলোচনা করে বা শিক্ষক-শিক্ষিকার সাহায্য নিয়ে লিখে ফেলো।

ছবির বিষয়বস্তু	দূষণের প্রকৃতি	ক্ষতিকর দূষকের প্রভাবের প্রকৃতি
১.		পাতার ওপর ধূলিকণা জমে পত্ররন্ধ্র বন্ধ হয়ে যাওয়া
২.	মাটিদূষণ	
৩.		
৪.	বায়ুদূষণ	পাথরের রং বদলে যাওয়া, ক্ষয়ে যাওয়া

তোমার এলাকায় এই ধরনের কী কী দূষণ ঘটতে দেখেছ?

বিশনয়দের গল্প

দিদিমণি সেদিন রাজস্থানের একটা খুব সুন্দর গল্প শোনালেন। তবে এটা ঠিক গল্প না, সত্যি ঘটনা। প্রায় সাড়ে পাঁচশো বছর আগে জামভাজি নামে একজন খুব জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মানুষকে পরিষ্কার - পরিচ্ছন্ন ও শান্তিতে থাকতে আর পরিবেশ ভালো রাখতে ভালো ভালো

উপদেশ দিতেন। তাঁর শিষ্যরা ঊনত্রিশটা উপদেশ মেনে চলত বলে তাদের বিশনয় বলা হয়। বিশ মানে কুড়ি আর নয় যোগ করলে ঊনত্রিশ। বিশনয়রা অকারণ গাছপালা কাটে না। কোনো পশুপাখির ক্ষতি করে না। তাদের গ্রামের আনাচে কানাচে হরিণ ময়ূর ঘুরে বেড়ায়। একবার রাজার লোকেরা তাদের গ্রামের গায়ে লাগা এক জঙ্গলে গাছ কাটতে এলে, বিশনয়ি মেয়েরা গাছদের জড়িয়ে ধরে বলে- তারা গাছ কাটতে দেবে না। সৈন্যরা রেগে গিয়ে হুকুম দিলো বিশনয়িরা গাছ না ছাড়লে অস্ত্র চালাবে। কিন্তু, বিশনয়িরা গাছকে জড়িয়ে ধরে প্রাণ দিলো। গল্পটা শুনে সবার চোখে জল এসে গেল।

দিলীপ জিজ্ঞাসা করল— এখন কীভাবে পরিবেশ রক্ষা করা যায়?

সুমীরা বলল— কেন রাস্তার দু-ধারে, ফাঁকা জমিতে গাছ লাগিয়ে। এভাবে একরকম বনসৃজন হয়।

প্রকাশ বলল— নোংরা জল যাতে পুকুর বা নদীর জলের সঙ্গে না মেশে তার ব্যবস্থা করে।

দিদিমণি বললেন— তোমরা আরও পরিবেশ রক্ষার উপায় ভেবে লেখো।

আমাদের দেশের উত্তরভাগ জুড়ে রয়েছে হিমালয়। আর তারই নীচে রয়েছে অসংখ্য গ্রাম। গ্রামগুলোকে ঘিরে রেখেছে বন। একসময় জ্বালানি আর কলকারখানার জন্য কিছু মানুষ গাছ কাটতে এল। গ্রামের মানুষ গাছকে জড়িয়ে ধরল। সবাই মিলে বাধা দিল। গাছ বাঁচাতে এগিয়ে এলেন সুন্দরলাল বহুগুণা। গ্রামের মানুষদের বোঝালেন। গোটা হিমালয় জুড়ে

হাঁটলেন। তখন ভারত সরকার হিমালয়ের নীচের জঙ্গলের গাছ কাটা নিষিদ্ধ করলেন। গ্রামের মানুষরা এইভাবে নিজেদের পরিবেশ নিজেরাই রক্ষা করল।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার আরাবারি জঙ্গল। একসময় ওখানে প্রচুর গাছপালা ছিল। গ্রামের মানুষ ওই গাছ কেটে জীবন চালাত। ফলে একদিন সেখানকার পরিবেশ নষ্ট হতে শুরু করল। গাছ কমতে শুরু করল।

সবাই চিন্তিত হয়ে পড়ল। এমন সময় এগিয়ে এলেন অজিত কুমার ব্যানার্জি । তিনি গ্রামের মানুষদের বোঝালেন। গ্রামের মানুষ শাল গাছের চারা বসাতে শুরু করল। তারপর সেই গাছ থেকেই তাদের জীবন চালানোর খরচ উঠতে শুরু করল। এভাবেই ফাঁকা হয়ে যাওয়া জায়গায় তৈরি হলো আবার একটি বিশাল বন।

মেঘালয়ের শিলং থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে রয়েছে বিখ্যাত মফলং পবিত্র বনভূমি। শান্ত সুনিবিড় জঙ্গল। বড়ো বড়ো কুর্জি গাছের আড়ালে ঢাকা পরে সূর্যের আলো। নানা ধরনের ভেষজ উদ্ভিদ রয়েছে এখানে। খাসি, জয়ন্তিয়ারা আগলে রেখেছেন এই বন। কোনো রকম ফুল ফল বা পাতা ছেঁড়া কঠোরভাবে বারণ।

নানারকম পুরোনো বাড়ি

নমিতা দাদুর সঙ্গে বেড়াতে বেরোল। এদিকটায় ও আগে কোনোদিন আসেনি। বেশ বড়ো বড়ো পুরোনো ধাঁচের বাড়ি এদিকটায়। দাদু আজ নমিতাকে রাখালদাদুর বাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন। হঠাৎ নমিতার চোখে পড়ল একটা ছোট্ট পাঁচিল ঘেরা জায়গা। ভালো করে তাকাতে দেখল একটা মন্দির।

নমিতা বলল— চলো না দাদু, একবার ভেতরে যাই।

মন্দিরটা বেশ পুরোনো! ভেতরে ঢুকতেই মন্দিরটা পুরো চোখে পড়ল। সামনের দিকটা কি সুন্দর কাজ করা।

দাদু বললেন— এটা টেরাকোটার কাজ।

নমিতা জিজ্ঞাসা করল — দাদু টেরাকোটা কী?

দাদু বললেন — নরম মাটি দিয়ে নানান মূর্তি বা নকশা তৈরি করা হয়। তারপর ওই মূর্তি বা নকশাকে আগুনে পুড়িয়ে নেওয়া হয়।

নমিতা জিজ্ঞাসা করল— দাদু, মাটিকে না পোড়ালে কী হতো? দাদু বললেন— পোড়ানো হয়েছিল বলেই মাটির মূর্তি বা নকশাগুলো এতদিন টিকে আছে। বেশি তাপে পোড়ালে মাটি শক্ত হয়। শক্ত পোড়ামাটি জলে সহজে নষ্ট হয় না। এই মন্দিরটা প্রায় পাঁচশো বছর আগের তৈরি। তখন তো এখনকার মতো সিমেন্ট আর বালি দিয়ে বাড়ি হতো না। চুন-সুরকির গাঁথনি ছিল। নমিতা ভাবল, কাল স্কুলে গিয়ে পুরোনো মন্দিরটার কথা সবাইকে বলতেই হবে।

তোমাদের এলাকার পুরোনো মন্দির/মসজিদ/গির্জা/ পুরোনো বড়ো বাড়ি দেখো। তারপর দলে মিলে লিখে ফেলো।

পুরোনো মন্দির, মসজিদ, বাড়ি, গির্জা	কী কী দিয়ে তৈরি	কতদিন আগে তৈরি	কারা তৈরি করেছে	সেটি এখন কী অবস্থায় আছে	কেন এই অবস্থা

রাখালদাদুর জাদুঘর

নমিতা দেখল রাখালদাদুর বাড়িটা খুব বড়ো। দেয়ালের কয়েকটা জায়গায় ইট দেখা যাচ্ছে। তবে ইটগুলো বেশ পাতলা। নমিতা বুঝল, এই বাড়িটাও খুব পুরোনো। বাড়ির ভেতরে ঢুকে নমিতা অবাক হয়ে গেল। ঘরগুলো লম্বা। ছাদগুলো অনেক উঁচু। মেঝে থেকে মোটা মোটা থাম উঠে ছাদে ঠেকেছে। জানালা-দরজাগুলো খুব বড়ো বড়ো। জানালার শিকগুলো মোটা মোটা। দরজার পাল্লার কড়াগুলো বেশ বড়ো।

সব ঘরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল নমিতা। একটা তাকে নানারকমের বই রাখা। তার মধ্যে কয়েকটা বই লাল শালুতে মোড়া।

নমিতা জিজ্ঞাসা করাতে রাখালদাদু বললেন— ওগুলো হলো পুঁথি। তারপর একটা পুঁথি নামিয়ে তিনি নমিতাকে

দেখালেন। নমিতা দেখল লাল শালুর ভেতর দুটো আয়তাকার কাঠের পাটা। ওপরের পাটাটা সরাতেই ভেতরে ওই মাপেরই তালপাতা পরপর সাজানো। তার ওপরে সুন্দর করে অনেক কিছু লেখা আছে। আরেকটা তাকে বেশ কয়েকটা হুঁকো রাখা। তার একটা দেখিয়ে দাদু বললেন— এটা আমার ঠাকুরদার আমলের। ঘরের একপাশে রাখা নানারকম মাছ ধরার জিনিসপত্র। বাঁশের তৈরি একটা লম্বা মতো খাঁচা। এছাড়াও ঘরটাতে পুরোনো দিনের নানান বাজনাও আছে। আর আছে মাটির বাসনপত্র, গয়নাগাটি।

দাদু বললেন— এই ঘরটা আমার জাদুঘর। তোমরা ইংরাজিতে যাকে বলো মিউজিয়াম। নমিতা বলল— দাদু, আমরা পারব না এরকম জাদুঘর বানাতে?

দাদু হেসে বললেন—নিশ্চয়ই পারবে। ইস্কুলে তোমরা সবাই মিলে একটা জাদুঘর বানাও। আমরা সবাই একদিন গিয়ে দেখে আসব। ফেরার পথে নমিতা ভাবল, কাল

ক্লাসে আরো একটা বিষয় বলতেই হবে। রাখালদাদুর জাদুঘরের কথা।

তোমার বাড়ির/প্রতিবেশীর বাড়ির পুরোনো জিনিস সংগ্রহ করো। তারপর লিখে ফেলো।

পুরোনো জিনিসের নাম	কী কী দিয়ে তৈরি	কতদিন আগের জিনিস	কী কাজে লাগে

ভারতবর্ষের মন্দির-মসজিদ-গির্জা

পরদিন ক্লাসে এসেই নমিতা আগের দিনের গল্প শুরু করল। পুরোনো মন্দির আর রাখালদাদুর জাদুঘরের কথা শুনে সবাই খুব খুশি। দিদিমণিও বললেন— বাঃ, বেশ খুঁটিয়ে দেখেছ তো। তোমরা কে কে এমন পুরোনো মন্দির, মসজিদ, গির্জা বা ঘরবাড়ি

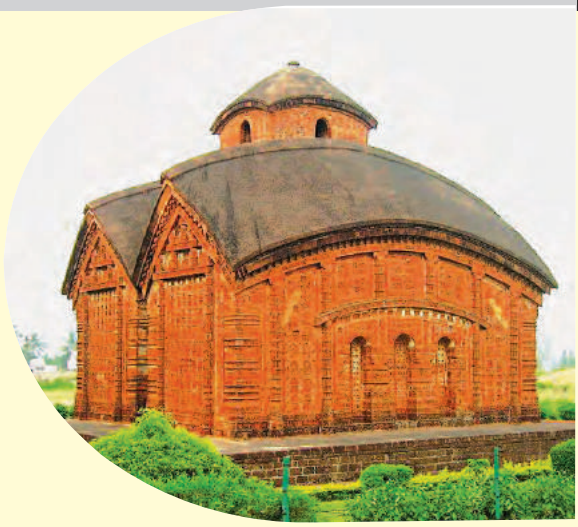

বাবলুর বিষ্ণুপুর দেখা— বাবলু বাবা-মায়ের সঙ্গে বিষ্ণুপুরে গিয়েছিল। লালমাটির জায়গা। ওই মাটি পুড়িয়ে তৈরি ইট দিয়েই বানানো হয়েছে নানা মন্দির। মল্লরাজাদের নামেই একসময় বিষ্ণুপুরের নাম ছিল মল্লভূম। মানে মল্লরাজাদের ভূমি বা অঞ্চল। তাঁদের সময়ে এমন অনেক মন্দির বানানো

হয়েছিল। রাসমঞ্চ, মন্দিরের গায়ে টেরাকোটার নানা কাজ সত্যিই সুন্দর। তবে কোথাও কোথাও মন্দিরের গায়ে লোকেরা আঁচড় কেটেছে। সেগুলো দেখে বাবলুর মন খারাপ হয়েছিল।

নাজমার সূর্যমন্দির দেখা--- নাজমা পুরী বেড়াতে গিয়ে কোনারকেও গিয়েছিল। সেখানে সূর্যমন্দির দেখে ওর খুব ভালো লেগেছিল। মন্দিরটা একটা বিরাট রথের মতো। চাকাও রয়েছে। ও রথের চাকাগুলো গুনে ফেলেছিল। বারো জোড়া চাকা। দেয়ালগুলোতে নানারকম মূর্তি। কিন্তু মন্দিরটা

ক্রমশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বঙ্গোপসাগরের খুব কাছেই এই মন্দির। নোনা জল-হাওয়ার জন্য মন্দিরটা নষ্ট হচ্ছে।

মায়ার জামা মসজিদ দেখা--- দিল্লি বেড়াতে গিয়ে মায়া জামা মসজিদ দেখতে গেল। কী বিশাল মসজিদ!

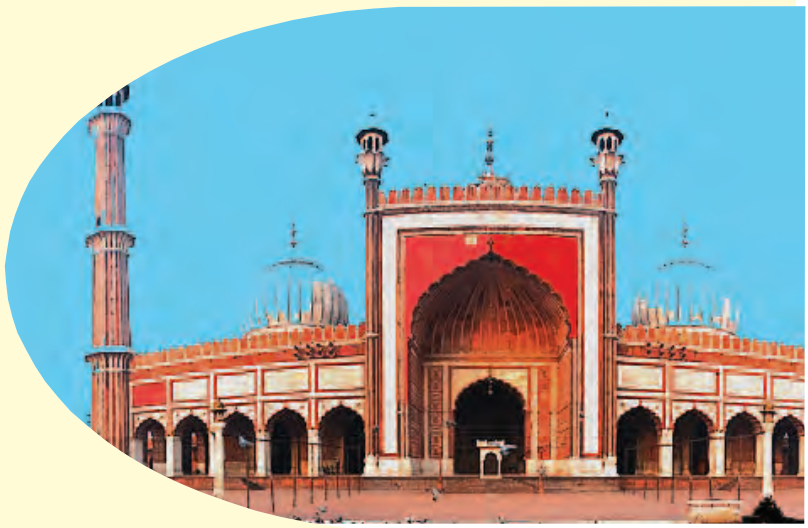

বিরাট বিরাট গম্বুজ। সামনে বিরাট বারান্দা। সেখানে কত লোক একসঙ্গে নামাজ পড়ছে। মুঘল সম্রাট শাহজাহান এই মসজিদ বানিয়েছিলেন।

টিপু সুলতান মসজিদ দেখা— একদিন মায়া টিপু সুলতান মসজিদ দেখেছিল। পরে জেনেছিল ওই

মসজিদটা কলকাতার বড়ো মসজিদগুলোর একটা। অনেকগুলো গম্বুজ মসজিদটায়। আর আছে মিনার। মসজিদের থেকে আজান শুনতে পেয়েছিল মায়া।

তপনের ব্যান্ডেল চার্চ দেখা— তপন বাবা-মার সঙ্গে ব্যান্ডেল চার্চে বেড়াতে গিয়েছিল। চার্চটি পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে পুরোনো খ্রিস্টান চার্চ। ১৬৬০ সাল নাগাদ এটা বানানো হয়েছিল। বছরের নানান সময় চার্চটি মানুষ দেখতে যায়। চার্চকে গির্জাও বলে। এখানে যিশুর জীবনের গল্প পুতুলের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

স্থাপত্য, ভাস্কর্য, সৌধ

১

২

দিদিমণি সবার বেড়ানোর কথা শুনলেন। তারপর বললেন--- তোমরা যা দেখেছ সেগুলো কোনোটা স্থাপত্য, কোনোটা সৌধ। আর তাদের দেয়ালে নানারকম নকশা বা ভাস্কর্যও দেখেছ।

৩

মায়া জিজ্ঞাসা করল— দিদি স্থাপত্য কোনগুলোকে বলে?

— পুরোনো দিনের বাড়ি, মন্দির, মসজিদ, গির্জা যা দেখেছ সবই স্থাপত্য। যেমন কোনারকের মন্দির, বিষ্ণুপুরের রাসমঞ্চ।

মায়া জিজ্ঞাসা করল— দিদি তাহলে সৌধ কী?

৪

৮

— সৌধও একটা স্থাপত্য। তার সঙ্গে কারোর না কারোর স্মৃতি জড়িয়ে থাকে।

মায়া বলল— তাই মমতাজের স্মৃতিতে বানানো বলে তাজমহল সৌধ।

৭

৬

৫

— ঠিক বলেছ।

পলাশ বলল— দিদি ভাস্কর্য কী?

— পাথর বা অন্য কিছুর গায়ে খোদাই করে নকশা, মূর্তি ফুটিয়ে তোলা হয়। এটাই ভাস্কর্য।

এই পৃষ্ঠার ছবিগুলির কোনটা স্থাপত্য ও কোনটা ভাস্কর্য? স্থাপত্যের মধ্যে কোনগুলো সৌধ? নীচের খোপে সেগুলোর পাশে টিক (✓) দাও। দরকারে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও।

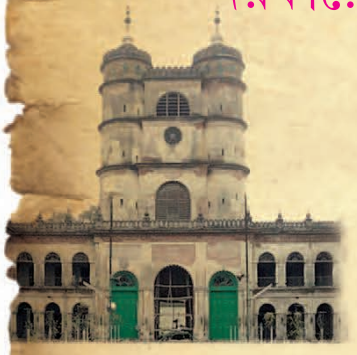

ছবি নং	স্থাপত্য	ভাস্কর্য	সৌধ
১			
২			
৩			
৪			
৫			
৬			
৭			
৮			

চলো বাঁচাই আমাদের স্থাপত্য

নমিতা বলল — দিদি, এই স্থাপত্য, ভাস্কর্যগুলো কি এখনও আগের মতোই আছে?

দিদিমণি বললেন — পৃথিবীতে অনেক স্থাপত্যই কয়েক হাজার বা কয়েকশো বছরের পুরোনো। ভূমিকম্প, বন্যা, ঝড়বৃষ্টিতে সেগুলির অনেক ক্ষতি হয়েছে। কোনারকের মন্দিরের একটা বড়ো অংশ ভূমিকম্পে ভেঙে পড়েছিল।

রাজীব বলল — আর কীভাবে স্থাপত্য, ভাস্কর্য নষ্ট হয়, দিদি?

দিদিমণি বললেন --- কলকারখানা, গাড়ির ধোঁয়া, ধুলোতেও স্থাপত্য ভাস্কর্যের ক্ষতি করে। তাজমহলের সাদা মার্বেল পাথর সব এখন আর সাদা নেই । তার গায়ে কোথাও কালচে, কোথাও হলদে ছাপ পড়েছে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল-এর ও একই অবস্থা।

তপন বলল — আমাদের গ্রামে একটা তিনশো বছরের পুরোনো মন্দির আছে। দেয়ালে নানা ধরনের টেরাকোটার কাজ ছিল। কিছু লোক অন্যায়ভাবে সেগুলি খুলে নিয়ে গেছে।

দিদিমণি বললেন — শুধু তাই নয়। অনেক সময় কিছু মানুষ স্থাপত্য বা ভাস্কর্যের গায়ে আঁচড় কাটে। পানের পিক ফেলে। দেয়ালে নাম লেখে। এইভাবে অনেক সুন্দর জিনিস নোংরা ও নষ্ট হয়ে যায়।

তোমার বাড়ি বা স্কুলের কাছে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এমন পুরোনো স্থাপত্য (বাড়ি, মন্দির, মসজিদ, গির্জা ইত্যাদি) খুঁজে বার করো। আলোচনা করে নীচে লিখে ফেলো।

স্থাপত্য কোথায় অবস্থিত	
কতদিন আগের তৈরি	

স্থাপত্যটির কোন কোন অংশ নষ্ট হয়ে গেছে	
কী কী কারণে নষ্ট হয়েছে	
স্থাপত্যটি রক্ষা করার জন্য	
তুমি কী করতে পারো	

কোনো স্থাপত্য বা ভাস্কর্য দেখতে গেলে আমরা কী করব আর কী করব না সে বিষয়ে লিখে ফেলো।

কী করব	কী করব না

নানারকম সংগ্রহশালা

দিদিমণি বললেন— রাখালদাদুর মতো তোমরাও জাদুঘর বানাতে পারো।

দিলীপ বলল — এত পুরোনো জিনিসপত্র পাব কোথায়?

দিদিমণি বললেন — সব সংগ্রহশালা শুধু পুরোনো জিনিস দিয়ে হয় না। এখনকার ব্যবহার করা জিনিস দিয়েও সংগ্রহশালা তৈরি করা যায়।

রহমান বলল --- আমাদের এক চাচার বাড়িতে একশোরকম চাল রয়েছে। এই চাল জোগাড় করা তাঁর শখ।

দিদিমণি বললেন — বিজ্ঞানের জিনিসপত্র জোগাড় করে সংগ্রহশালা করা যায়। আবার নামকরা মানুষদের লেখাপত্র, ব্যবহার করা জিনিসপত্র দিয়েও সংগ্রহশালা হয়। তোমরা কি কেউ এমন সংগ্রহশালা দেখেছ?

আদিবাসী মানুষের সংগ্রহশালা

গত বছর ডমরু রাঁচি বেড়াতে গিয়েছিল। সেখানে বিরসা মুন্ডার নামে একটা মিউজিয়াম দেখেছে ডমরু। সেখানে ওই অঞ্চলের পুরোনো মানুষের ব্যবহার করা নানা জিনিসপত্র রাখা আছে। মাছ ধরার নানারকম জাল আর যন্ত্রপাতি। নানা ধরনের ছুরি, কাটারি আর কাস্তে। আদিবাসী মেয়েদের গয়নাগাটি, পোশাক, বাসনপত্র সেখানে রাখা আছে।

বাসের মধ্যে মিউজিয়াম !

রসুল একবার একটা বাস দেখতে গিয়েছিল। তাতে বিজ্ঞানের নানা যন্ত্রপাতি রয়েছে। নানারকম ছবি। একটা সুইচ টিপলেই পৃথিবীটা সূর্যের চারপাশে ঘুরছে। আবার একটা আয়না তাতে তাকালে মুখ বদলে যায়। স্যার বলেছিলেন বাসটা আসলে বিজ্ঞানের সংগ্রহশালা। ঘুরে ঘুরে ছাত্রছাত্রীদের ও সাধারণ মানুষদের বিজ্ঞান শেখায় ও বোঝায়।

জাদুঘরে ওরা

কলকাতায় একটা জাদুঘর আছে। ভারতীয় জাদুঘর। এই জাদুঘরটা দেশের সবচেয়ে পুরোনো। সেখানে রানি তার বাবা মায়ের সঙ্গে গিয়েছিল। ওরা একটা মমি দেখেছিল। বাবা বলেছিলেন, মিশর দেশের রাজা রানিরা মারা গেলে তাদের মৃতদেহ ওষুধ দিয়ে রাখা হতো। সেই মৃতদেহগুলিকে মমি বলা হয়। এছাড়া জাদুঘরে ওরা অনেক পুরোনো মূর্তি ও আরো নানা জিনিসপত্র দেখেছিল।

কয়েকটি সংগ্রহশালা:

দিদিমণি বললেন --- আজ তোমাদের কয়েকটি সংগ্রহশালার কথা বলি। তোমরা যদি এদের কোনোটায় গিয়ে থাকো, তবে কী কী দেখেছ। কী শিখলে তা খাতায় লেখো।

রাজাভাতখাওয়া প্রকৃতিবীক্ষণ কেন্দ্র

জলপাইগুড়ি জেলায় বক্সা অরণ্যের মাঝে এই সংগ্রহশালা। ভুটানের রাজার সঙ্গে কোচবিহারের রাজার যুদ্ধ হয়েছিল। এই সংগ্রহশালার দেয়ালে সেই যুদ্ধের ছবি আঁকা আছে। নানাধরনের ভেষজ উদ্ভিদ

রয়েছে। নানাধরনের পশু-পাখির মৃতদেহ ওষুধ দিয়ে রাখা আছে। এই পশু ও পাখিদের দেখলে বক্সা জঙ্গল সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি হয়।

নয়া-পিংলার পটচিত্র সংগ্রহশালা

পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলা গ্রাম। রংবেরঙের পটচিত্রের জন্য বিখ্যাত। কাপড়ে বা কাগজের ওপর নানা রঙের ছবি আঁকা। ঘরে ঘরে নানা পটচিত্র রাখা আছে। কিছু কিছু পটচিত্র বেশ পুরোনো।

লেপচা মিউজিয়াম

দার্জিলিং জেলার কালিম্পং-এ আছে লেপচা মিউজিয়াম। সেখানে নানাধরনের লেখা পত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। আর আছে পুরোনো দিনের মানুষের ব্যবহৃত নানা জিনিসপত্র।

গান্ধি স্মারক সংগ্রহালয়, ব্যারাকপুর

উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুরে রয়েছে এই সংগ্রহশালা। মহাত্মা গান্ধির ব্যবহার করা জিনিসপত্র এখানে রয়েছে। তাছাড়া অনেকরকম বইপত্র, নানা ধরনের মূর্তি ও ছবি রয়েছে এই সংগ্রহশালায়।

দিঘা বিজ্ঞানকেন্দ্র

এই বিজ্ঞানকেন্দ্রে রয়েছে আকাশ দেখার ব্যবস্থা। সামুদ্রিক নানা মাছ জীবন্ত অবস্থায় রাখা আছে কাচের বাক্সে। বৃষ্টির জল সংরক্ষণের মডেল রয়েছে এখানে। এগুলো দেখে বেশ সহজ লাগে বিজ্ঞানের বিষয়গুলো।

বেশ মজা করে বোঝা যায়, জানা যায়। এছাড়া বর্ধমান, পুরুলিয়াতেও বিজ্ঞান কেন্দ্র রয়েছে।

বিড়লা শিল্প-কারিগরি সংগ্রহশালা

কলকাতায় এই সংগ্রহশালাটি অবস্থিত। এটি পূর্ব ভারতের সবচেয় পুরোনো বিজ্ঞান মিউজিয়াম। বহু রকমের যন্ত্রপাতির নমুনা রাখা হয়েছে। সেগুলো কীভাবে কাজ করে তাও নানান ছবি ও মডেল দিয়ে বোঝানো হয়েছে। এখানে একটি নকল কয়লার খনি রয়েছে। সেটা একেবারে আসল কয়লাখনির আদলে গড়া।

গুরুসদয় দত্ত মিউজিয়াম

কলকাতা থেকে খানিক দূরে ঠাকুরপুকুরে ব্রতচারী গ্রাম। সেখানে ব্রতচারীর প্রতিষ্ঠাতা গুরুসদয় দত্তের নামে একটি সংগ্রহশালা রয়েছে। বাংলার লোকশিল্পের নানা জিনিসপত্র রাখা আছে এই সংগ্রহশালায়।

চলো বানাই সংগ্রহশালা

ইস্কুলে সংগ্রহশালা বানানোর কথায় সবাই খুব মজা পেল। ঠিক করল সবাই মিলে দলবেঁধে বেরোবে। সঙ্গে থাকবেন দিদিমণি। দিদি বললেন--- বেশ তো। চলো, আমরা স্কুলে সংগ্রহশালা বানাব।

আয়ুব বলল — দিদি আমার কাছে অনেক পুরোনো দেশলাই বাক্স আছে। আমার বাবা ছোটোবেলায় জমাতেন।

নয়ন বলল— আমার ঠাকুমার কাছে পুরোনো রুপোর কয়েন আছে।

সোমা বলল— আমার কাছে চাকা লাগানো কাঠের হাতি, পাখি আছে।

দিদি বললেন— বাঃ, এই তো। তোমরা তো সবাই তৈরি দেখছি। চলো সংগ্রহশালা বানানো যাক।

এবার তোমরা সবাই মিলে তোমাদের স্কুলে একটা ঘরে সংগ্রহশালা বানাও। স্কুলের কোনো এক অনুষ্ঠানে তোমাদের সংগ্রহ করা পুরোনো জিনিসপত্র অঞ্চলের মানুষকে দেখাও।

তোমরা নীচের জিনিসগুলো কীভাবে রাখবে তা সাজিয়ে লেখো।

ক) হাতের নানা কাজ— যেমন বাখারি দিয়ে তৈরি ঝুড়ি।

খ) পুরোনো বাসনপত্র

গ) পুরোনো আমলের পোশাক

ঘ) পুরোনো দিনের ছবি— হাতে আঁকা, কিংবা পটে আঁকা ছবি, ফোটোগ্রাফ

ঙ) পুরোনো বইপত্র

চ) বাড়িতে থাকা পুরোনো মূর্তি, পয়সা, টাকা।

ছ) পুরোনো বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম।

জ) কোনো জায়গায় বেড়াতে গিয়ে পাওয়া/নিয়ে আসা জিনিসপত্র

ঝ) ডাকটিকিট, চিঠিপত্র,পুরোনো ডায়ারি, খবরের কাগজ, দেশলাই বাক্স, মার্বেল ইত্যাদি।

তোমাদের সংগ্রহ করা জিনিসগুলো কোন সময়ের তা জানার চেষ্টা করো। তারপর সাদা কাগজে তা লিখে লেবেল লাগাও। সেইসময় মানুষ এগুলোকে কীভাবে কাজে লাগাত তা জানো। এগুলো কী দিয়ে তৈরি তা লেখো। কোন জায়গায়, কীভাবে খুঁজে পেয়েছ তাও লেখো।

জিনিসের নাম	কী কাজে লাগত	কী দিয়ে তৈরি	কোন জায়গায় পাওয়া গেছে

নীচের ছবিটি তোমরা খুশিমতো রং দিয়ে ভরিয়ে দাও

নীচের ছবিটি তোমরা খুশিমতো রং দিয়ে ভরিয়ে দাও

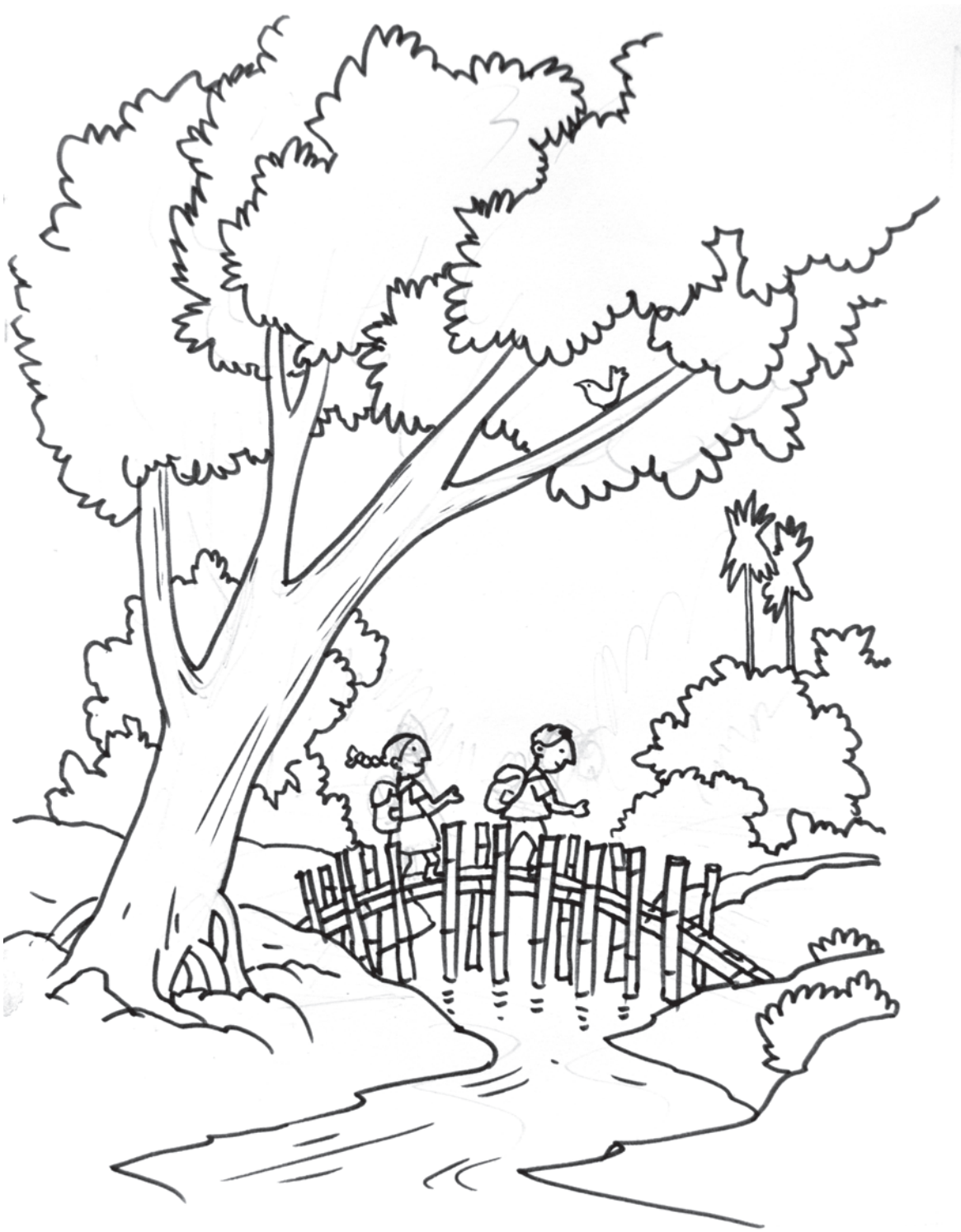

নীচের ছবিটি তোমরা খুশিমতো রং দিয়ে ভরিয়ে দাও

নীচের ছবিটি তোমরা খুশিমতো রং দিয়ে ভরিয়ে দাও

আমার পাতা-১

এই বই তোমার কেমন লেগেছে?
লিখে, এঁকে বুঝিয়ে দাও

আমার পাতা-২

এই বই তোমার কেমন লেগেছে?
লিখে, এঁকে বুঝিয়ে দাও

আমাদের পরিবেশ (চতুর্থ শ্রেণি)

পাঠ্যসূচি

১) পরিবেশের উপাদান ও জীবজগৎ

ক) পরিবেশের পরিচিতি
খ) উদ্ভিদ বৈচিত্র্য
গ) প্রাণী বৈচিত্র্য
ঘ) প্রাণীর অভিযোজন (গমন, শ্বাসগ্রহণ, দেহের আবরণ,খাদ্যগ্রহণ ভিত্তিক)
ঙ) জীবের বিলুপ্তি ও সংরক্ষণ

২) পরিবেশের উপাদান

ক) বস্তু ও পদার্থ
খ) পদার্থের বিভিন্ন অবস্থা
গ) পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন
ঙ) মিশ্রণ থেকে উপাদান পৃথককরণের বিভিন্ন পদ্ধতি

৩) শরীর

ক) খাদ্যগ্রহণ ও শরীরে পরিপাক
খ) অসুখ থেকে বাঁচতে খাদ্য (সুষম খাদ্য)
গ) খাদ্য ও প্রতিদিনের কাজ
ঘ) শ্বাসবায়ু ও স্বাস্থ্য

৪) আবহাওয়া ও বাসস্থান

ক) বায়ুর উপাদান
খ) আবহাওয়া ও ঋতু
গ) বাসস্থানরূপে পৃথিবী
ঘ) বেড়ানো, অচেনা জায়গা আবিষ্কার ও পৃথিবীকে চেনা

৫) আমাদের আকাশ

ক) দিন ও রাত
খ) চাঁদ
গ) তারা দেখা : ধ্রুবতারা ও সপ্তর্ষিমন্ডল
ঘ) মহাকাশ

৬) প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের অভিজ্ঞতা

ক) জল, আগুন, গাছ, পশু, পাখি ও পাথর
খ) প্রকৌশলের বিকাশ
গ) ধাতুর ব্যবহার
ঘ) চাকা ও সভ্যতা
ঙ) যান্ত্রিক সুবিধার ধারণা
চ) দাহ্যবস্তু, বর্জ্য, বিষাক্ত প্রাণী থেকে ঝুঁকি ও নিরাপত্তা বিধিসমূহ
ছ) ওষধি গাছ ও মানুষের স্বাস্থ্য

৭) জীবিকা ও সম্পদ

ক) পশ্চিমবঙ্গে ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী জীবিকার বৈচিত্র্য
খ) অলিখিত জ্ঞান ও শিল্প (কলা ও হাতের কাজ)
গ) লোককথা, গান, নাচ, অভিনয় ও ছবি

৮) মানুষের পরিবার ও সমাজ

ক) পরিবার থেকে সমাজ
খ) বিভিন্ন ধরনের সমাজ
গ) কৃষি ও পশুপালন
ঘ) খাদ্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও খাদ্য বিনিময়

৯) আধুনিক সভ্যতা ও পরিবেশের সংরক্ষণ

ক) মাটি, জল ও বাতাসের দূষণ
খ) দূষণের প্রভাব
গ) পরিবেশ সংরক্ষণ ও মানব উদ্যোগ

১০) সৌধ ও সংগ্রহশালা

ক) প্রাথমিক ধারণা
খ) স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও সংগ্রহশালা
গ) সৌধ ও সংগ্রহশালার উপযোগিতা ও সংরক্ষণ

তিনটি পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পাঠ্যসূচি

১) প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন : পরিবেশের উপাদান, জীবজগৎ, জড়বস্তুর জগৎ, শরীর, আবহাওয়া ও বাসস্থান (পৃ.১—৬৫)

২) দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন : আমাদের আকাশ, প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের অভিজ্ঞতা, জীবিকা ও সম্পদ (পৃ.৬৬—১১৭)

৩) তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন : মানুষের পরিবার ও সমাজ, আধুনিক সভ্যতা ও পরিবেশের সংরক্ষণ, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও সংগ্রহশালা (পৃ.১১৮—১৬০)

প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের জন্য সক্রিয়তামূলক কার্যাবলী	প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নে ব্যবহৃত সূচকসমূহ
১) সারণি পূরণ	১) অংশগ্রহণ
২) ছবি বিশ্লেষণ	২) প্রশ্ন ও অনুসন্ধান
৩) তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ	৩) ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের সামর্থ্য
৪) দলগত কাজ ও আলোচনা	৪) সমানুভূতি ও সহযোগিতা
৫) কর্মপত্র পূরণ ও সমীক্ষার বিবরণ	৫) নান্দনিকতা ও সৃষ্টিশীলতার প্রকাশ
৭) সঙ্গী মূল্যায়ন ও স্ব-মূল্যায়ন	
৮) হাতের কাজ ও মডেল প্রস্তুতি	
৯) ক্ষেত্র সমীক্ষা (Field work)	

প্রশ্নের নমুনা

(এই ধরনের নমুনা অনুসরণ করে পার্বিক মূল্যায়ন প্রশ্নপত্র তৈরি করা যেতে পারে। প্রয়োজনে অন্যান্য ধরনের প্রশ্নও ব্যবহার করা যেতে পারে। কী কী ধরনের প্রশ্ন করা যেতে পারে তার একটি নকশা দেওয়া হলো)

১ **সঠিক উত্তর নির্বাচন করো :**

- নীচের কোন প্রাণীটির শিরদাঁড়া নেই — (ক) আরশোলা (খ) কুনো ব্যাঙ (গ) রুই মাছ (ঘ) টিকটিকি
- ভাত কী ধরনের খাবার — (ক) শাকসবজি (খ) ফল (গ) দানাশস্য (ঘ) ফুল
- শ্বাস ছাড়ার সময় শরীরে তৈরি হওয়া যে গ্যাসটা আমাদের দেহ থেকে বেরিয়ে যায়, সেটা হল — (ক) অক্সিজেন (খ) নাইট্রোজেন (গ) নিষ্ক্রিয় গ্যাস (ঘ) কার্বন ডাইঅক্সাইড
- টুসু পরব হয় — (ক) আষাঢ় মাসে (খ) কার্তিক মাসে (গ) পৌষ মাসে (ঘ) বৈশাখ মাসে

২ **শূন্যস্থান পূরণ করো :**

(ক) আবহাওয়া বাতাসের _____ পরিমাণের ওপর নির্ভর করে। (খ) মানুষ _____ পশুকে শিকার করে মাংস খেত।

(গ) আগুন জ্বালাতে _____ পাথর লাগত। (ঘ) জঙ্গলের পাশের মানুষ _____ সংগ্রহ করেন। (ঙ) সমাজ শব্দের একরকম মানে হলো _____ ।

৩ **ভুল বাক্যটির পাশে কাটা (×) ও সঠিক বাক্যটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও।**

(ক) হাতি, মানুষ আর শিম্পাঞ্জি সামাজিক প্রাণী। (খ) মানুষ ভেড়াকে প্রথম পোষ মানিয়েছিল। (গ) তরলযুক্ত খাবার বায়ুশূন্য অবস্থায় কাগজের প্যাকেটে বা টিনে রাখা হয়। (ঘ) নরম মাটি দিয়ে নানান মূর্তি বা নক্সা তৈরি করা হলো টেরাকোটা। (ঙ) 'খাঁচার ভিতর' গানটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা।

৪. **ক ও খ স্তম্ভের মধ্যে সম্পর্ক দেখাও।**

ক স্তম্ভ		খ স্তম্ভ	
a	পদার্থ	1.	আবর্জনা
b	মাংস	2.	বাড়ির ঘুলঘুলি
c	হাতিয়ার	3.	যার ভর আছে ও যে কিছুটা জায়গা নেয়
d	কাচের টুকরো	4.	নদিয়ার কৃষ্ণনগর
e	মৃৎশিল্প	5.	অস্ত্রশস্ত্র
f	চড়াই পাখি	6.	জলসেচ ব্যবস্থা
		7.	দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে খেতে হয়

৫ . **বেমানান শব্দটি খুঁজে বার করো** (ক) নিড়ানি, কাস্তে, ট্রাকটর (খ) কুকুর, গোরু, বাঘ (গ) চাল, আলু, হিমঘর (ঘ) সিমেন্টের ধুলো, কচুরিপানা, শ্বাসকষ্ট (ঙ) তাজমহল, কোনারকের মন্দির, বিষ্ণুপুরের রাসমঞ্চ

৬. **পার্থক্য দেখাও :** (1) প্রশ্বাস-নিশ্বাস (2) তরল-গ্যাস (3) নির্মল বায়ু-দূষিত বায়ু (4) গ্রীষ্ম-শীত (5) পূর্ণিমা-অমাবস্যা (6) হাতিয়ার-টুল (7) কাগজ-প্লাস্টিক (8) পল্লির গান-সারি গান (9) কৃষি সমাজ-শিল্প সমাজ (10) স্থাপত্য-ভাস্কর্য

৭. **একটি বাক্যে উত্তর দাও :** 1) তাজমহলের সাদা মার্বেলের গায়ে ছোপ পড়ার কারণ কী? 2) বিজ্ঞানকেন্দ্রে বেড়াতে গেলে তুমি কী দেখতে পাবে? 3) পরিবেশ রক্ষার জন্য বিশনয়িরা কী করেছিল? 4) দড়ি, বস্তা, ব্যাগ বানাতে কোন উপাদান কাজে লাগে? 5) চাকাকে শক্তপোক্ত করার জন্য মানুষ কী করেছিল? 6) গাছের খাবার তৈরি করতে কী কী লাগে? 7) গরমকালে বিকালে তুমি বেশি খেলার সময় পাও কেন? 8) ধাতু চিনবে কী করে? 9) শীতকাল আর বর্ষাকালের মেঘের রঙের তফাৎ কী? 10) লেপ-তোশক বানানোর সময় বাতাসে কী মিশে যায়? 11) খাবার থেকে কীভাবে শক্তি পাও তা তীর চিহ্নের মাধ্যমে বাক্সে দেখাও ☐ → ☐ → ☐ 12) খালি চোখে দেখা যায় না এমন প্রাণীদের কীভাবে দেখা যায়?

৮. **দু-তিনটি বাক্যে উত্তর দাও :** 1) গাছের পাতাকে ব্যবহার করে কীভাবে বিভিন্ন প্রাণী বেঁচে থাকে? 2) পাখিরা আকাশে দীর্ঘ সময় ওড়ে কীভাবে? 3) কোন জিনিসের ভর কীভাবে মাপা হয়? 4) মুড়ি থেকে মুড়ির গুঁড়ো আর চাল থেকে ধানের খোসা কীভাবে আলাদা করা যায়? 5) দাঁতের কাজ কী কী? 6) আবহাওয়ার তিনটি বৈশিষ্ট্যের নাম লেখো। 7) তোমার দেখা তিনটি প্রাণীর বাসস্থানের নাম লেখো। 8) তোমার ছায়ার দৈর্ঘ্য সারাদিনে কীভাবে বদলায়? 9) চাঁদের কলঙ্ক কী? 10) কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে আমরা কী কী বিষয় জানতে পারি? 11) আগুন ব্যবহার জানার পর মানুষের জীবনে কী কী পরিবর্তন ঘটেছিল? 12) মানুষের জীবনে গাছের তিনটি ভূমিকা লেখো। 13) লোহার জিনিস ব্যবহারের সুবিধা কী কী? 14) পুরোনো দিন থেকে আজকের চাকায় কী কী বদল ঘটেছে? 15) দৈনন্দিন জীবনে লাঠির ব্যবহারের ফলে কী কী সুবিধা পাওয়া যায়? 16) অলিখিত জ্ঞানের দুটি উদাহরণ দাও। 17) পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া ও মালদা জেলার নাচের বৈশিষ্ট্য কী কী? 18) আত্মীয় শব্দের অর্থ বুঝিয়ে লেখো। 19) তোমার চারপাশের সমাজের মানুষের খাবার, পোশাক, উৎসব সম্পর্কে একটি করে বাক্য লেখো। 20) খাবার নষ্ট না করতে মানুষ কী কী ব্যবস্থা নিয়েছে? 21) জল কী কী কারণে দূষিত হয়? 22) বায়ু দূষিত হলে মানুষ ও পরিবেশের কী কী সমস্যা হয়? 23) জাদুঘরে বেড়াতে গেলে তোমার কী কী অভিজ্ঞতা হতে পারে? 24) সংগ্রহশালা কত ধরনের হতে পারে?

৯. **নিম্নলিখিত বিষয়গুলো ব্যাখ্যা** কর :

জড় পদার্থ, জীবের কাজ, জন্তুদের খাবার, বিভিন্ন জীবের সম্পর্ক, জলের গাছের বৈশিষ্ট্য, গাছের ডালে ঝোলা জন্তুর বৈশিষ্ট্য, আকাশে ওড়া প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য, জলজ প্রাণীর বৈশিষ্ট্য, হারিয়ে যাওয়া প্রাণী, পদার্থ, বস্তু, গ্যাস, কঠিন,

তরল, মিশ্রণ, দাঁড়িপাল্লা, থিতানো, অবস্থার পরিবর্তন, ছাঁকনি, দাঁতের যত্ন, প্যাকেটের খাবার, মানুষের খাদ্য, হজম, খাদ্যনালি, শক্তি, সুষম আহার, গাছের খাবার তৈরি, ফুসফুস ভালো রাখা, বাতাসের গ্যাস, গরম, বৃষ্টি, ঠান্ডা, আবহাওয়া, আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলাফল, ঋতু, বাসস্থান, বিপন্ন বাসভূমি, মরুভূমি, নোনাজলের বাসস্থান, বাসস্থানরূপে বনভূমি, পরিযায়ী পাখি, জলদাপাড়া, টোটো, রাভা, মেচ, গন্ডার, ছায়া, পৃথিবীর ঘোরা, চাঁদ , গ্রহ, উপগ্রহ, চাঁদের ঘোরা, সপ্তর্ষিমন্ডল, ধ্রুবতারা ও নৌ-যাত্রা, মহাকাশ অভিযান, কৃত্রিম উপগ্রহ, মানুষের অগ্রগতি ও জল, আগুন ও মানুষের খাবার, আগুন ও মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপন, মানুষের জীবনে আগুন, গাছের উপকার ও মানুষের জীবন, পশুপাখির মানুষের জীবনে ভূমিকা, মানুষের প্রতিদিনের জীবন ও যন্ত্র, টুল ও তার ব্যবহার, পাথরের ব্যবহারের নানা দিক, ধাতব জিনিসপত্র ও তার ব্যবহার, মানুষের জীবনে ব্যবহৃত নানা ধাতু, ধাতুর ব্যবহারের উপকারিতা, চাকার পরিবর্তন, দাহ্যবস্তু ও বিপদ, দাহ্যবস্তু ও সাবধানতা, আবর্জনার উৎস, আবর্জনার ক্ষতিকর প্রভাব, সাপের বিষ, সাপের কামড় ও মানুষের কর্তব্য, মানুষের শরীর খারাপে ওষুধি গাছ, ভেষজ গাছ, পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষের জীবিকা, সমভূমির মানুষের জীবিকা, নকশিকাঁথা, বাঁশের ব্যবহার, মাটির কাজ, মুখোশ, ডোকরা, শিল্প, কুটির শিল্প, না-পড়ে শেখা নানা কাজ, পটচিত্র, লোককথা, লোকগান, নাচ, ছৌ, গুহাচিত্র, সমাজের নানা দিক, সমাজ তৈরির কথা, সমাজে ছেলেদের ভূমিকা, আদি সমাজ, নানা ধরনের সমাজ, চাষের নানা ধাপ, ফসল চাষের আদিকথা, ফসল চাষে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, পালিত প্রাণী, পোষ মানা পশু ও হিংস্র পশু, পশু পোষ মানানোর আদিকথা, মানুষের জীবনে নানা উৎসব ও চালের ব্যবহার, মাছের রান্না ও মিষ্টির রকমফের, হাটবাজার ও খাবারের বিনিময়, খাবারকে ভালো রাখা, খারাপ মাটি, জলের ব্যবহার, নোংরা জল, বাতাসের ধুলোধোঁয়া ও মানুষের কষ্ট, দূষক, বিভিন্ন ধরনের দূষক, বিশনয়, সুন্দরলাল বহুগুণা, টেরাকোটা, পুঁথি, কোনারকের সূর্যমন্দির, জামা মসজিদ, ব্যান্ডেল চার্চ, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, তাজমহল, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, জাদুঘর, গুরুসদয় দত্ত মিউজিয়াম,নিজের হাতে সংগ্রহশালা বানানোর নানা উপকরণ।

১০. মিলযুক্ত শব্দগুলো খুঁজে বার করো :

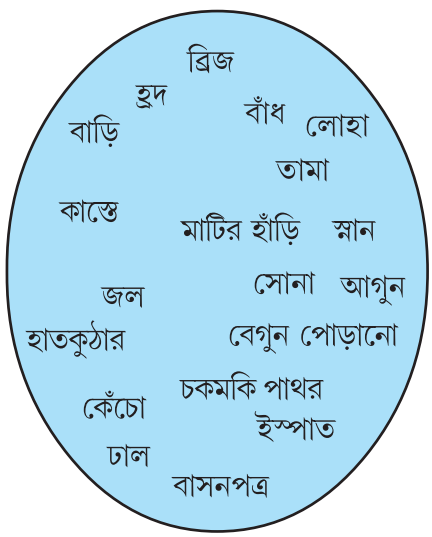

শিখন পরামর্শ

স্বাগত, বন্ধুরা। আসুন আমরা সবাই মিলে প্রতিটি শিশুর শিক্ষার অধিকার বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে জ্ঞানগঠনের পথ প্রশস্ত করি।

শিশু ও তার শৈশব নিয়ে ভালোভাবে দেখলে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথাগত শিক্ষার বাইরেও তাদের নানা কৌতূহল ও প্রশ্ন থাকে। কারণ তারা তাদের চারপাশের পরিবেশের সঙ্গে একাত্ম হয়ে থাকে। সারাক্ষণ নতুন কিছু আবিষ্কারের নতুন কোনো ডাকে সাড়া দেবার নেশায় বিভোর। আপন মনেই নতুন কিছু পড়ে তার মানে খুঁজে নেবার চেষ্টা করে। এভাবেই স্বাভাবিক উপায়ে তার চারপাশ সম্পর্কে জ্ঞানগঠনেও সাহায্য করে। সেই শিক্ষা তাকে নিজেকে বুঝতে সাহায্য করে। প্রতিটি শিশুই জ্ঞান ও সংস্কৃতিভাণ্ডারের উত্তরাধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, যা তার নিজস্ব কার্যকলাপ বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে নতুনভাবে তাৎপর্য পায়। শিশু তার চারপাশের পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে নিজের মতো করে। সেকারণে ছোটো ছোটো মজার পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও নানা বিষয়ের তথ্য সংগ্রহ এবং আলোচনার মাধ্যমে শিশুর সামগ্রিক বিকাশের সুযোগ দিতে হবেই এখন থেকেই।

শিক্ষা সংগঠিত হয় নানারকম আদানপ্রদান, কথোপকথন আর কাজের মাধ্যমে। চারপাশের প্রকৃতি, পরিবেশ, বস্তু ও মানুষের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে। বিভিন্ন প্রকার সৃজনশীল ও নান্দনিক কাজকর্মে অংশগ্রহণ, প্রশ্ন অনুসন্ধান, বন্ধুদের বা বড়োদের সঙ্গে সমানুভূতি ও সহযোগিতার পরিমণ্ডলে শিশু তার জ্ঞান অর্জনের পথ প্রশস্ত করে। তাই আমরা এই বইতে দল বেঁধে কাজ করতে শেখাই । এরফলে পরস্পরের থেকে সামাজিক মূল্যবোধ ও একসঙ্গে কাজ করার অনুপ্রেরণা পেতে পারে। দলগতভাবে কাজ করা, হাতেকলমে কাজ, ভয়শূন্যভাবে অংশগ্রহণ, অন্যকে সাহায্য করা— এসবের মধ্যে দিয়ে শিশুর স্বশিখনের আবহ সৃষ্টি করার দায়িত্ব আমাদের সকলের।

শিশুর পরিবেশ চর্চা যা শুরু হয়েছিল তৃতীয় শ্রেণি থেকে তা অখণ্ডভাবেই এগিয়ে চলছে চতুর্থ শ্রেণিতেও তার স্থানীয় পরিবেশ ও আপন অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে। জগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে তাকে উপলব্ধি করতে হবে নানা বিষয়। সংলাপধর্মী এই বই শিশুকে পাঠে উৎসাহিত করবে। ছোটো ছোটো দলে অভিনয়ের সুযোগ করে দেবে। ভয়হীনভাবেই কথা বলার মধ্যে দিয়েই অর্থ খুঁজে নেওয়ার তাগিদ অনুভব করবে, তবে এব্যাপারে আপনাদের সাহায্য আবশ্যক। প্রয়োজনে আপনার অঞ্চলের স্থানীয় অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবেন। শিশুর জ্ঞানগঠনের প্রক্রিয়া কেবলমাত্র পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে যাতে আবদ্ধ না থাকে সেবিষয়ে নজর দেবেন। এই বই-এ বিবৃত নানা বিষয়ের মধ্যে থেকে শিশুরা যেন তাদের বৈচিত্র্যময় জীবনের ছবি পায়।

জীবজগৎ থেকে শুরু করে স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও সংগ্রহশালায় শেষ

আমার চারপাশ ও আমি

শিশু নিজের চারপাশের পরিবেশের নানা উপাদান নিয়ে আলোচনা করবে ১পৃষ্ঠা থেকে ১৭ পৃষ্ঠায়। এই অংশে আমাদের চারপাশের পরিবেশের অখণ্ডতা সামগ্রিকভাবেই তুলে ধরা আছে। চারপাশের কোন উপাদানগুলো জড়ো আর কোন উপাদানগুলি সজীব সে বিষয়ে নিজেরা আলোচনা করবে। আপনি তাদের আলোচনায় উৎসাহ দেবেন, অংশগ্রহণ করবেন। প্রকৃতিতে প্রতিটি প্রাণীকে দেখায় উৎসাহিত করবেন। তাদের গঠন, কাজ এমনকি তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে জ্ঞান গঠনে সাহায্য করবে। সূক্ষ্ম প্রাণী যেমন অ্যামিবা, প্যারামেসিয়াম প্রভৃতি দেখার জন্য অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য নেবেন, না থাকলে অবশ্যই ছবি দেখাবেন। স্থানীয়ভাবে নানা পশুপাখি পর্যবেক্ষণে উৎসাহিত করবেন। ইতিহাসের

পাতায় বেশ কিছু প্রাণীর অস্তিত্ব জানা গেছে, যা আজ আর নেই। স্থানীয়ভাবে কোনো প্রাণী হারিয়ে গেছে কিনা তার সমীক্ষা ভবিষ্যতে বিশেষ দলিল হিসাবে গণ্য হতে পারে। এবিষয়টি যাতে শিশুরা উপলব্ধি করতে পারে তার জন্য আপনারা নাটকের উপস্থাপনা করতে পারেন। লক্ষ রাখবেন শিশুরা যেন প্রতিটি কাজে অংশগ্রহণ করে। তাদের প্রশ্ন করায় উৎসাহ দিন। পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও নানা প্রয়োগের মধ্য দিয়ে বিষয়টি যেন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে সে দিকে বিশেষ নজর দেবেন।

এরপর এসেছে পরিবেশের উপাদান ও জড় বস্তুর জগৎ। ১৮ থেকে ২৬ পৃষ্ঠায়। এবিষয়টি পুরোটাই শিশুকে হাতেকলমে বুঝে নেওয়ার পথ তৈরি করে দিয়েছে। শিশুর চারপাশের নানা জড় জিনিসপত্র কীভাবে স্থান দখল করে থাকে সেবিষয়ে পর্যবেক্ষণ করার কথা বলা হয়েছে। এবিষয়ে শিশু যাতে আলোচনায় অংশগ্রহণ, বিশ্লেষণ ও নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারে সেবিষয়ে নজর দেবেন। এইভাবে শিশুর বিভিন্ন জড় বস্তুর ওজন সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি হবে। তবে ওজন অপেক্ষা ভর কথাটি ঠিক। সেবিষয়ে আপনি সচেতনভাবে শিশুদের ধরিয়ে দেবেন। শিশুর সামাজিক অভিজ্ঞতায় ওজন কথাটি প্রচলিত। নানারকম মিশ্রণ থেকে নানা উপাদান পৃথক করা একটা মজার খেলা। এই খেলার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলুক বিজ্ঞানের এক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। শিশুদের নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ও প্রয়োগের উৎসাহ দিন।

প্রসঙ্গ এসেছে ২৭ থেকে ৪৫ পৃষ্ঠায় খাদ্য গ্রহণ ও শ্বাসবায়ু বিষয়ে। শিশুর চারপাশের নানা উদ্ভিদ ও প্রাণী কীভাবে তার খাবার তৈরিতে সাহায্য করে সেবিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এছাড়াও প্যাকেট করা নানা খাবার ও বিভিন্ন প্রাণীর খাবার ধরন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তবে এই বিষয়ে শিশু তার স্থানীয় অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নিজের মতো করেও কিছু তালিকা তৈরি করতে পারে। ছবি আঁকতে পারে। নিজের মতো করে কিছু খাবারের নাম বলতে পারে। এ বিষয়ে আপনি অবশ্যই উৎসাহ দেবেন। এখানে দাঁত ও দাঁতের ব্যবহার বিষয়ে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। শিশুরা যাতে দলবেঁধে একাজে অংশগ্রহণ করে সেবিষয়ে বিশেষ নজর দেবেন। তবে এখানে দেওয়া নানা প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই বাড়ির বড়োদের এবং আপনাদের সাহায্যে জানতে পারে সেবিষয়ে সজাগ থাকবেন। খাবার খাওয়ার পর আমাদের শরীরে তা কীভাবে হজম হয় সেবিষয়ে শিশুর ভাষায় লেখা হয়েছে। আপনি ছবি/চার্ট/মডেলের মাধ্যমে বিষয়টি আরও প্রাণবন্ত করে তুলতে পারেন। অসুখ থেকে বাঁচতে নানা কাজ করতে কীভাবে খাবার সাহায্য করে তা স্থানীয় অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে শিশুকে আলোচনায় উৎসাহিত করবেন। দেখবেন প্রতিটি শিশু যেন এই কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। গাছের খাবার তৈরি এবং শ্বাসবায়ু ও স্বাস্থ্য নিয়ে এখানে স্বল্প আলোচনা আছে। Terminology ব্যবহার না করে শিশু নিজের ভাষায় নিজের অভিজ্ঞতায় উক্ত বিষয় যাতে জ্ঞান গঠন করতে পারে সেবিষয়ে নজর দেবেন।

এরপর এসেছে আবহাওয়া ও বাসস্থান ৪৬ থেকে ৬৫ পৃষ্ঠায়। প্রতিটি উদ্ভিদ ও প্রাণী শুধু পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল নয়, প্রকৃতি ও পরিবেশের ওপরও যে তাদের বেঁচে থাকা নির্ভর করে সেবিষয়েও লেখা হয়েছে। এখানে লেখা বিভিন্ন কথোপকথন শিশুকে স্থানীয়ভাবে নিজের চারপাশের ব্যাপারে ভাবনায় উদবুদ্ধ করবে। আপনার কাজ তাদের সেই ভাবনাকে উৎসাহিত করা। এভাবেই তারা নিজেরাই খুঁজে নেবে বাতাসের নানা উপাদান। আবহাওয়ার রকমফের সম্বন্ধে ধারণা গঠন করবে। নানা আবহাওয়া আমাদের চারপাশের প্রকৃতির যে পরিবর্তন ঘটে সেই বিষয়ে আপনার সৃজনশীল, আনন্দদায়ক উপস্থাপনা শিশুকে আরও কৌতূহলী করে তুলবে। ঋতু পরিবর্তনের নানা রূপ নিয়ে স্থানীয় পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে আপনার উপস্থাপনা শিশুকে চারপাশের বায়ুমন্ডল ও তার নিজস্ব চৌহদ্দির সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করে তুলবে। শিশু তার চারপাশের নানা উদ্ভিদ ও প্রাণী পর্যবেক্ষণ করবে। প্রত্যেকেরই যে বেঁচে থাকার জন্য আশ্রয় প্রয়োজন সেবিষয়ে সহানুভূতিশীল হবে। আপনার কাজ হবে তাদের এই বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া, তাদের নানা কৌতূহল নিবৃত্ত করা। বিভিন্ন সাহিত্যে ইতিহাসের পাতায় স্থান পাওয়া বিভিন্ন প্রাণী বা উদ্ভিদের আশ্রয়হীন হয়ে হারিয়ে যাওয়ার কাহিনি তুলে ধরবেন। আসলে ভবিষ্যতে সুন্দর স্বাভাবিক পরিবেশ নির্মাণে আপনার সহায়তায় আজকের শিশুরা উৎসাহিত হয়ে

উঠবে। অজানাকে জানার অচেনাকে চেনার শিশুদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। তাই শিশু প্রতিটি মুহূর্তে কৌতূহলী হয়ে থাকে। আমাদের কাজ তাদের এই প্রবৃত্তি আরও বাড়িয়ে দেওয়া। অচেনার আনন্দ অনুভব করতে দূরে কোথাও যাওয়ার দরকার নেই। নিকটেই লুকিয়ে রয়েছে নানা আনন্দ। আপনার সাহায্যে শুরু হোক সেই আনন্দ খোঁজার পালা।

রাতের আকাশে তারা খুঁজতে খুঁজতে এসে গেছে আমাদের আকাশ প্রসঙ্গ। ৬৬ পৃষ্ঠা থেকে ৭৬ পৃষ্ঠা আমাদের আকাশ। হাতের কাছে থাকা টর্চ, পেন প্রভৃতির ব্যবহারে দিনরাতের প্রসঙ্গকে সহজ করে তুলে ধরা হয়েছে। আপনার কাজ শ্রেণিতে ছোটো ছোটো প্রদর্শনের মাধ্যমে এবিষয়টিকে আরও সহজ করে তোলা। আপনার সাহায্যেই শুরু হোক রাতের আকাশে তারা দেখা, মেঘেদের আনাগোনা দেখা। শিশু আপন মনে খুঁজে নিক তার জীবনের ছন্দ।

পরের বিষয় 'প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের অভিজ্ঞতা' ৭৭ থেকে ৯৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। সভ্যতার বিকাশে জলের অবদান নিয়ে এবিষয়টি শুরু। বেঁচে থাকার জন্য জল কতটা জরুরি সেবিষয়ে শিশুকে অংশগ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। তারপর সভ্যতা বিকাশে জল, আগুন, পাথর, চাকা, ধাতু, লাঠি এবং সর্বোপরি গাছ কীভাবে সাহায্য করে সেবিষয়ে মজা করে লেখা আছে। যাতে শিশু বিষয়টি পাঠ করতে পারে। আগুন, ধাতু ও চাকার আবিষ্কার কীভাবে আমাদের সমাজজীবনকে পালটে দিল তার ইতিহাস জানবে ও প্রয়োগ করতে শিখবে। যন্ত্রের নানা ব্যবহার নিয়ে আলোচনা বিষয়টিকে যাতে নতুন মাত্রা দেয় সেবিষয়ে লক্ষ রাখবে। এমনিতে শিশুর যন্ত্র বিষয়ে অপার কৌতূহল থাকে। তবে এবিষয়ে বড়োদের সচেতন থাকাই ভালো। এবিষয়টির শেষ দিকে শিশুর চারপাশের পরিবেশ থেকে সৃষ্ট বিপদের ঝুঁকি ও নিরাপত্তা হিসাবে সাপের কামড়কে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এবিষয়ে আপনার যথাযথ উপস্থাপনা শিশুর জ্ঞান গঠনের পথকে সঠিক দিশা দেখাবে। ভেষজ উদ্ভিদের ব্যবহার ও আলোচনা স্বাস্থ্যসুরক্ষার দিকটিকে আলোকপাত করবে। তবে এব্যাপারে চার্ট, মডেল ও অডিয়ো-ভিশুয়ালের ব্যবহারে বিষয়টিকে আরও প্রাণবন্ত করা দরকার।

এরপরের বিষয় জীবিকা ও সম্পদ ১০০ পৃষ্ঠা থেকে ১১৭ পৃষ্ঠা। সম্ভাব্য প্রসঙ্গ ধরে নানারকম গল্প করে বোঝানো হয়েছে যে বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষের বিভিন্ন জীবিকার কথা। নানা আলোচনা ও স্থানীয় বিষয়ে খোঁজখবর করে শিশুমনে জীবিকা সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা গড়ে উঠবে। স্থানীয় ইতিহাস সম্পর্কে এসব সন্ধান তাকে নতুন পথ খুঁজে নিতে সাহায্য করবে। চাষের ইতিহাস থেকে শুরু করে এখনকার দিনে চাষবাসে নানা যন্ত্রের ব্যবহারের নানা প্রসঙ্গ এসেছে। কিছুটা হয়তো অনেক দূরের ইতিহাস। কিছুটা কাছের, পাশাপাশি অত্যাধুনিক নানা যন্ত্রের ব্যবহার নিয়ে আলোচনা হয়েছে। জীবিকার প্রয়োজনে পশু-পাখির ব্যবহার প্রসঙ্গে শিশুর স্থানীয় অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দেবেন। প্রয়োজনে শ্রেণিকক্ষে অডিয়ো/ভিশুয়ালের মাধ্যমে বিষয়টিকে প্রাণবন্ত করে তুলবেন চাষবাসের পাশাপাশি শিল্পও যে প্রয়োজন সেবিষয়ে শিশুমনে প্রাথমিক ধারণা গড়ে উঠবে। পরিবেশকে অক্ষুণ্ণ রেখে কীভাবে শিল্প গড়ে তোলা যায় সেবিষয়ে আলোচনা আসবে। আমাদের নানা জেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে নানা শিল্প। যা কোনো বিশেষ ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের মধ্যে দিয়ে গড়ে তোলা হয়নি। জীবিকার প্রয়োজনে মানুষই তার স্রষ্টা। সেবিষয়ে শিশু যাতে স্থানীয় অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে খোঁজখবর করে সে দিকে নজর দেবেন। প্রয়োজনে স্থানীয় শিল্পীদের বিদ্যালয়ে এনে আলাপ করতে পারেন। এতে শিশুরাও উৎসাহ পাবে। শিল্পকলা ও চারুকলা চর্চার প্রসারে শিশুদের প্রাথমিক ধারণা নির্মাণ করতে এই বিষয়।

১১৮ পৃষ্ঠা থেকে ১৩৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে মানুষের পরিবার ও সমাজ। গল্পচ্ছলে, কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে শিশুমনে সমাজের ধারণা গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে এই বিষয়ে আপনি স্থানীয় অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এই ধারণাকে আরো সহজ করে তুলতে পারেন। ইতিহাসের পথ ধরে সমাজ সৃষ্টির ধারণা তৈরি করা হয়েছে। নানা সমাজের নানা খাদ্যাভ্যাস। খাদ্য সংরক্ষণ বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে। আপনি এবিষয়ে ওদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে পারেন। এবিষয়ে অনুসন্ধানে শিশুদের আরো উৎসাহ দিন।

সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ দূষিত হয়েছে আবার বেঁচে থাকার তাগিদে পরিবেশ সংরক্ষণ করার প্রয়াসও শুরু হয়েছে। ভবিষ্যতে সুন্দর পরিবেশ নির্মাণে আজকের শিশুদের অংশগ্রহণ খুবই জরুরি। তাই এই ব্যাপারে ১৪০ পৃষ্ঠা থেকে ১৫২ পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হয়েছে। আধুনিক সভ্যতা ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়টিতে আকর্ষণীয় ছবি ও গল্পের সমাহারে শিশুদের তার স্থানীয় অঞ্চলের জল, বায়ু, মাটির দূষণের নানা ব্যাপারে খোঁজখবর করার প্রেরণা দেওয়া হয়েছে। আপনার সক্রিয় অংশগ্রহণে এই বিষয় আরো প্রাণবন্ত হয়ে উঠুক। তবে এই দূষণ থেকে উত্তরণের উপায় যেমন শিশুরাই উদ্ভাবন করবে তেমন কিছু উদাহরণ হিসাবে জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণকে ইতিহাসের পাতা থেকে তুলে আনা হয়েছে। আপনার আরো সংযোজন এই বিষয়টিকে আরও সমৃদ্ধ করবে। স্থানীয়ভাবে যাতে শিশুরা কাজ করতে পারে অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়ে আপনি স্থানীয় পরিবেশ সুরক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন।

বিচিত্র ও বিরাট সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারে সমৃদ্ধ আমাদের শিশুরা। তাদের মনে সাংস্কৃতিক ও শৈল্পিক সচেতনতা সৃষ্টি করতে এবং সম্ভাব্য সমস্ত শক্তি ও মজুত ভাণ্ডারকে সংহত ও উন্মুক্ত করতে হবে। তাই ১৫৩ পৃষ্ঠা থেকে ১৬০ পৃষ্ঠায় রয়েছে স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও সংগ্রহশালা। আমাদের প্রতিটি জেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এর নানা নিদর্শন। স্থানীয় মন্দির/মসজিদ/গির্জা পর্যবেক্ষণ ও তাদের ইতিহাস অন্বেষণের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠুক আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা। তাই এবিষয়ে আপনাদের সাহায্য বিশেষভাবে দরকার। এর মধ্য দিয়েই শিশুমনে তৈরি হবে ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধা, যা একান্তভাবে শুরু হবে স্থানীয়স্তরেই। আমাদের নানা স্থাপত্যের গায়ে মানুষের নানা শিল্পকলা দু-চোখ ভরে দেখতে উৎসাহ দিন শিশুদের, তাদের সেবিষয়ে ছবি আঁকতে দিন। হয়তো কাছাকাছি কোনো সংগ্রহশালা নেই। তাতে কী, শিশুরা নিজেরাই সংগ্রহশালা গড়ে তুলুক বিদ্যালয়ে। বিদ্যালয়ে ঘর না থাকলে, বছরের কোনো এক নির্দিষ্ট দিনে প্রর্দশনী করুন। এখানে কিছু সংগ্রহশালার ছবি দেওয়া আছে। সেখানে বেড়াতেও নিয়ে যেতে পারেন। তবে এসব সংগ্রহশালার যে বিবরণ দেওয়া আছে সেখান থেকে কোনো প্রশ্ন করবেন না। এটা নিছকই ওদের আনন্দ দেওয়ার জন্য।

উপসংহার

শিশুর বিকাশ সম্পর্কে সামগ্রিক মূল্যায়ন করতে হলে প্রতিটি ক্ষেত্রে তার বিকাশ ও পছন্দ বিচার করতে হবে। সেই কারণে তথ্যসংগ্রহ ও ব্যাখ্যা করতে হবে আর শিক্ষার্থীর কাজগুলি গভীরভাবে লক্ষ করতে হবে। তবে শিশুর স্বভাব-প্রকৃতি অনুযায়ী সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব হবে। নিরবচ্ছিন্ন ও সার্বিক মূল্যায়নের রিপোর্ট কার্ড অনুযায়ী নিয়মিত সমীক্ষার দ্বারা শিশুর শিখনের জন্য মূল্যায়ন করা খুবই জরুরি। শিশু প্রতিটি বিষয়ের আনন্দদায়ক শিখন-শিক্ষণে কতটা অংশগ্রহণ করতে পারছে তা দেখা আমাদের বিশেষ কর্তব্য। পড়া, লেখা, শোনায় তার আগ্রহ কতটা তা দেখা ভীষণ জরুরি। শিশু বইটি পাঠে আনন্দ পাচ্ছে কিনা, বন্ধুদের সঙ্গে পাঠের নানা কাজে অংশগ্রহণ করতে পারছে কিনা সেবিষয়ে নিয়মিত নজর দেওয়া প্রয়োজন। শিশুকে প্রশ্ন করতে উৎসাহ দিন। অনুসন্ধানে আরো বেশি করে আগ্রহ বৃদ্ধি করুন, যাতে সে তার মতো ব্যাখ্যা করতে পারে। প্রয়োগ করতে পারে তার সুযোগ করে দিন। প্রত্যেকের কাজের প্রশংসা করুন। কাউকে ভুল বলবেন না, তবে যা দেখছেন সেবিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করুন যাতে শিশুর বিকাশের মূল্যায়ন করা যায়। সেইমতো ঘাটতি/অসুবিধা দূর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া যায়। শিখনের জন্য মূল্যায়নে শিশুর শিক্ষণের মান ও বিকাশ সম্পর্কে অভিভাবকদের নিয়মিত অবহিত করানো যেতে পারে। মনে রাখবেন এই প্রক্রিয়া কখনোই প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে উৎসাহিত করার জন্য নয়। শিশু তার কর্মসম্পাদনে কতটা সহানুভূতিশীল এবং সহযোগিতাপূর্ণ সেবিষয়েও বিশেষ নজর থাকবে, যা শিশুকে সৃষ্টিশীল ও নানা কাজে উৎসাহ জোগাবে। শিশুর বিভিন্ন পারদর্শিতা বুঝতে প্রতিটি পাঠে দেওয়া নানা কর্মপত্র এবং স্থানীয় অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আপনার সাহায্যে করা নানা কাজের মাধ্যমে এই মূল্যায়ন আপনি করতে পারেন। পরিশেষে আপনি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সামগ্রিক শিখনের ওপর পরীক্ষা নিতে পারেন। তবে প্রশ্ন করার সময় খেয়াল রাখবেন উত্তর যেন তাদের নিজ নিজ বিষয়ে বা কাজের নিরিখেই দিতে পারে পাঠ্যপুস্তকের বাইরে গিয়েও।